KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলকাতা-৭৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 C.M.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৪ আশ্বিন, ১৩৬৪ কার্তিক, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌমিত্র শঙ্কর চক্রবর্তী, আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

	বই-এর নাম	লেখক
১।	রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য	—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
২।	হাতের রেখায় জীবন রহস্য	—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খ
৩।	Expression & Language of the Unconscious	—Sri Sabyasa
৪।	নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব	—শ্রীসব্যসাচী
৫।	নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য	—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী
৬।	জ্যোতিষী শিক্ষা	—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০·০
৭।	Jyotish Sanchayan	
৮।	Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hin Answer	—Viswanath Deva Sarm
৯।	বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ	—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
১০।	Table of Ascendants & Ephemeris	—By N. C. Lahiri
১১।	লঘুজাতকম্	—অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
১২।	বৃহৎজাতকম্	—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৩।	জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ	—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
	ঐ	৩য় খণ্ড
১৪।	গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	ডাঃ রণতোষ সাহা
১৫।	ফলদীপিকা	—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৬।	ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ	—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭।	জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ	—শ্রীমলয় রায়
১৮।	মিথ্যা নয়, সত্য	—প্রীতি রায়
১৯।	গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	—ডাঃ রণতোষ সাহা

ভি.পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০·০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অ

সমকালীন

সম্পাদক
সীমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

৪র্থ বর্ষ ভাদ্র ১৩৬৪

সমকালীন

পঞ্চমবর্ষ : ভাদ্র ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগর : বিনয় ঘোষ ২৮১
ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা : সোমেন বসু ২৯০
ভারতে জাতীয়তাবোধ উন্মেষণায়—ভগিনী নিবেদিতা : চিত্তরঞ্জন পাল ৩০০
কালিদাসের কাব্যে ফুল : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০৯
ক বি তা ॥ স্বপ্ন-সঞ্চারিণী : আবীর ঘোষ ৩১৯
আলো আলো : সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত ৩২০
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দোপাধ্যায় ৩১৫
আ লো চ না ॥ শিশুশিক্ষা-সমস্যা : সরিৎশেখর মজুমদার ৩২১
সং স্কৃ তি প্র স ঙ্গ ॥ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী : রবীন্দ্র সেনগুপ্ত ৩২৩
স মা জ স ম স্যা ॥ আত্মীয়তার বালাই : অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৩২৫

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪ চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও
চৈতন্য প্রেস ২ ভাস্করদত্ত লেন কলিকাতা—৪ হইতে মুদ্রিত।

সমকালীন
পঞ্চম বর্ষ ॥ ভাদ্র, ১৩৬৪

'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিত বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের সঠিক স্থান নির্দেশ করতে হলে, প্রথমে তাঁর বিদ্যানুশীলনের কথা বলা প্রয়োজন। কারণ বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার ও মাতৃভাষা চর্চার একটা বিশেষ প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার কালে সকলেরই অবশ্য তাই ছিল, 'কেবলসাহিত্য' বা 'literature for literature's sake' নীতির উদ্ভব তখনও হয়নি। রাজসভার কবিরাও উদ্দেশ্য-প্রধান সাহিত্য রচনা করতেন। আদিরসাত্মক বা আধ্যাত্মিক বিষয় পরিবেশন করে, পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজড়া জমিদারদের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য॥ আধুনিক যুগে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের পর সাহিত্যের পোষকশ্রেণীর পরিবর্তন হল। সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সমঝদারগোষ্ঠীর পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে, আধুনিক সাহিত্যের ও মাতৃভাষার, বিশেষ করে গদ্যভাষার, ভিত্ নির্মাণ করেছিলেন যাঁরা তাঁরা তাঁদের পোষক বা পাঠকদের 'মনোরঞ্জন' করার জন্য উদ্‌গ্রীব হননি। সাম্প্রতিক অর্থে, 'মনোরঞ্জনের' সমস্যাও তখন তাঁদের সামনে দেখা দেয়নি। উপন্যাস বা গল্পের মতন তার উপযুক্ত 'form' বা রূপেরই বিকাশ হয়নি তখনও। উদীয়মান মধ্যবিত্তের মনে সাহিত্যের রুচিবোধ জাগিয়ে তোলা, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আস্বাদনে তাঁদের প্রলুব্ধ করা, সাহিত্যপাঠে শিক্ষা দেওয়া এবং সাহিত্যের বিপুল সৃজন-সম্ভাবনার আভাস দেওয়াই ছিল আধুনিক যুগের প্রথম সাহিত্যসাধকদের আদর্শ। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে সাহিত্যের এই আদর্শই অনুসৃত হয়েছিল এবং যাঁরা তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদেরই বলা হত "হিউম্যানিস্ট" পণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক। সেই অর্থে, বিদ্যা-সাগরকেও আমরা আমাদের দেশের একজন আদর্শ "হিউম্যানিস্ট" পণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক বলতে পারি। না বললে, বা সেই দিক দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও বিদ্যানুশীলনের বিচার না করলে, তাঁর প্রতি ও তৎকালের প্রতি অবিচার করা হয়॥

মামুলি রীতিতে তাই বিদ্যাসাগর-সাহিত্যের বিচার না করে, ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে হবে। সকলেই জানেন, বাংলার জনসমাজে বিদ্যাসাগর 'পণ্ডিত' বলে পরিচিত ছিলেন। আজও তাঁকে 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' না বললে যেন তাঁর নামটিকে খণ্ডিত করা হল বলে মনে হয়। ইংরেজ রাজপুরুষরাও 'the Great Pundit' বলে তাঁর নামোল্লেখ করতেন। 'পণ্ডিত' যে

তিনি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কি-রকমের পণ্ডিত, কোন জাতের পণ্ডিত? পণ্ডিত তাঁর পূর্বেও ছিলেন অনেকে, তাঁর সমকালেও ছিলেন, পরবর্তী কালেও হয়েছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে না হলেও, অনেকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে 'পণ্ডিত' ছাড়াও আর একটি ব্যক্তির সত্তা ছিল। সেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিচার করা যায় না। এই ব্যক্তিত্বই "হিউম্যানিস্ট" পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিত অনেকে ছিলেন, কিন্তু এই "হিউম্যানিস্ট" ব্যক্তিত্ব সকলের ছিল না। বিদ্যাসাগরের ছিল এবং এত বেশী পরিমাণে ছিল যে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। হয়েছে বলেই বিদ্যাসাগরের মতন পণ্ডিত 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়' 'উপক্রমণিকা' ইত্যাদি লিখেছেন। পাঠ্য-পুস্তক রচনাতেই তাঁর সাহিত্য জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। অনেকের কাছে এটা রহস্যই বটে! বহু দুর্বোধ্য রচনার পসরা সাজিয়ে যিনি তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করে সকলকে চমৎকৃত করতে পারতেন, তিনি লিখলেন 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়'। এ-রহস্য অনাবৃত করা সম্ভব নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য না বুঝলে। সেই বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নয়, 'হিউম্যানিস্টের' পাণ্ডিত্য। এখন প্রশ্ন হল, হিউম্যানিস্ট বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য কি? হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত কাকে বলা হয়?

এই প্রসঙ্গে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'হিউম্যানিজম' মূলতঃ রেনেসাঁসের জীবনদর্শন। তার দার্শনিক অর্থ প্রত্যক্ষভাবে মানবপ্রেম বা মানবতাবোধ নয়, যদিও পরোক্ষভাবে তাই। মানবপ্রধান বা মানবকেন্দ্রিক চিন্তাই হল তার ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থ। আধুনিক যুগের মানুষের নতুন চিন্তাধারার উৎস হল এই 'হিউম্যানিজম্'। মধ্যযুগের 'God-ism' বা ঈশ্বরপ্রধান চিন্তার বিপরীত এই চিন্তাধারাকে বোধ হয় 'Human-ism' না বলে কেবল 'Man-ism' বললে কোন বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকত না। এ যুগের চিন্তা প্রধানত 'anthropo-centric' বা মানবকেন্দ্রিক, সেকালের বা মধ্যযুগের চিন্তা প্রধানত 'theo-centric বা ঈশ্বর-ও-ধর্মকেন্দ্রিক। নবযুগের এই চিন্তা-ধারা ও জীবনদর্শনেরই নাম 'হিউম্যানিজম্', বাংলায় 'মানবযুথীনতা' বলা যায়। রেনেসাঁসের যুগের বিদ্যাচর্চার প্রেরণা ছিল এই 'হিউম্যানিজম্'। তাই 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের অধ্যাত্মবিদ্যা ও "স্কলাস্টিসিজমের" চর্চা না করে, ক্ল্যাসিকাল যুগের গ্রীক লাটিন বিদ্যার পুনরুজ্জীবনে মনোনিবেশ করেছিলেন। রেনেসাঁসের যুগকে তাই 'revival of learning'-এর যুগও বলা হয়। এই revival বা প্রাচীন বিদ্যার পুনঃচর্চার মূলে প্রেরণা ছিল 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের। তা যদি না থাকত, কেবল যদি তা revivalism হত, তাহলে ইতিহাসে তা "প্রতিক্রিয়াশীল" প্রচেষ্টা বলেই নিন্দিত হত, প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত হত না। সাধারণ পণ্ডিত, মধ্যযুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আর নবযুগের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতের এই বিদ্যাদর্শের পার্থক্যটাই প্রধান। রেনেসাঁসের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সিমণ্ড্স বলেছেন : ১

১ J. A. Symonds : A Short History of the Renaissance in Italy (London 1893) : P. 6

Men found that in classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, *by which they might profit in the present.*

ক্ল্যাসিকাল যুগে এমন এক জীবনাদর্শের সন্ধান পেল মানুষ তখন, যা অনুসরণ করে তারা বর্তমানে লাভবান হতে পারে। "By which they might profit in the present"—কথার তাৎপর্য গভীর। নবযুগের মানুষের অগ্রগতির পথে সহায় হতে পারে, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে, এমন সব নীতি ও আদর্শ হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। ক্ল্যাসিকাল যুগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিকথা, পুরাণকথা, শিল্পশাস্ত্র—সর্বক্ষেত্রে তাঁরা এই মানবমুখীন জীবনধর্মী আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, বিস্মৃতির সমাধি থেকে তাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, এবং সেই গৌরবময় ঐতিহ্যে মানুষকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করার জন্য তার ঐকান্তিক অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। রেনেসাঁসের এই পাণ্ডিত্যের সাধনা ও বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে সিমণ্ড্স বলেছেন : ২

It was scholarship, first and last, which revealed to men the *wealth* of their own minds, the *dignity* of human thought, the *value* of human speculation, the *importance* of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas . . . . The Renaissance opened to the whole reading public the treasure-houses of Greek and Latin literature.

এই বিদ্যানুশীলনের ফলে মানুষের মনের সম্পদ, চিন্তার ঐশ্বর্য, কল্পনার মহত্ত্ব এবং সবার উপরে মানবজীবনের শাস্ত্রাতিরিক্ত স্বতন্ত্র মূল্যায়ন সম্বন্ধে মানুষের চেতনা জাগে, গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের লুপ্ত রত্নভাণ্ডার সকলের সামনে খুলে দেওয়া হয়। বাংলার নবজাগরণের যুগে এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যানুশীলনের ফলে, এদেশের মানুষের মনে যাঁরা এই নতুন বিচারবোধ ও জীবন-বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম তো বটেই, আমার মনে হয় 'সর্বশ্রেষ্ঠ' ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বাংলার রেনেসাঁসের দুজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মী—রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার পরিবেশে মানুষ হন নি। পরবর্তীকালে সে-বিদ্যা তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় আয়ত্ত করলেও, তাঁদের জ্ঞানবিদ্যার ভিত্ রচিত হয়েছিল এদেশের ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যা দিয়ে। ইংরেজী শিক্ষার অনেক আগে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও এদেশের ক্ল্যাসিকাল বিদ্যায় পণ্ডিত হয়েছিলেন, ইংরেজী বা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা-শিক্ষার আগে। এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির এই পাকাপোক্ত ক্ল্যাসিকাল বনিয়াদের জন্যই, রামমোহন বা বিদ্যা-সাগর কেউই, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাদর্শের প্রভাবে তাঁদের উদার সমদৃষ্টি হারান নি, এবং ভারতীয় ও

২ Symonds : op. cit, pp. 7—8

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সমীকরণে ব্যর্থ হননি। নবজাগরণের পথপ্রদর্শনে বরং তাঁরাই সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য হয়েছিলেন। ইতিহাসের এই শিক্ষার গুরুত্ব আছে। কেবল ইংরেজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে এদেশে নবজীবনের বা নবজাগরণের জোয়ার এসেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আংশিক সত্য মাত্র। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতন যুগনায়করা যদি প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্মৃত সম্ভার পুনরনুসন্ধান ও পুনরাবিষ্কার করে, লোকসমাজে তুলে না ধরতেন, প্রকাশ ও প্রচার না করতেন, যদি তার ভিতর থেকে নবযুগের প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রেরণা তাঁরা খুঁজে না পেতেন, তাহলে কেবল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক পণ্ডিতদের বাণীর জাদুস্পর্শে, বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে নবজাগরণের এরকম আলোড়ন হত না। হলেও তা ক্ষণস্থায়ী হত এবং সমাজের উচ্চস্তরের সংকীর্ণতম গণ্ডীর মধ্যের তা সীমাবদ্ধ থাকত। প্রাচীন বেদ উপনিষদ পুরাণ ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যান ও প্রচার আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যতখানি সাহায্য করেছে, পাশ্চাত্ত্য মনীষী বেকন, লক্, হিউম্, টম্ পেইন, ভল্‌টেয়ার, ভল্‌নি, রুশো, কোমতের বাণী তার চেয়ে বেশী কিছু করেনি। এই সব পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের বাণী ঘোষণা অরণ্যে-রোদনের মতন ব্যর্থ হত, যদি এদেশের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকে তার পরিপোষক নীতি বা আদর্শগুলি অনুসন্ধান করে পুনরাবিষ্কার না করতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই কাজ কঠোর অনুশীলন ও অধ্যবসায় সহকারে করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা নবজাগরণের আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল। সিমণ্ড্‌স বলেছেন : ৩

Not only did scholarship restore classics and encourage literary criticism; it also encouraged theological criticism. In the wake of theological freedom followed a free philosophy.

রামমোহন তাঁর ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা এই 'theological criticism' বা আধ্যাত্মিক সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক বা ধর্মবিষয়ের এই স্বাধীন আলোচনা থেকেই এযুগের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার ও জীবনদর্শনের বিকাশ হয়েছিল। বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় অনুবাদ ও টীকাও করেছেন রামমোহন। বঙ্গানুবাদ ও তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রতিপালন করেছেন সদ্যোজাত বাংলা গদ্যভাষাকে, কারণ গদ্যভাষা মূলতঃ—"a language of discourse"—যুক্তিতর্কই তার প্রাণ। পূর্বের সমাজে এই যুক্তিতর্কের পরিবেশই সৃষ্টি হয়নি, তার সুযোগও ছিলনা তখন। নতুন সামাজিক পরিবেশে যখন যুক্তিতর্কের, বুদ্ধিবিবেচনার অবকাশ হল, তখন কাব্যিক ছন্দোবন্ধন ছিন্ন করে, দ্রুতগতিতে বিকাশ হতে থাকল নবযুগের বন্ধনমুক্ত বলিষ্ঠ ও বেগবান বাংলা গদ্যভাষার। বাংলা গদ্যভাষায় প্রথম বেগ বলিষ্ঠতা ও যুক্তিবদ্ধতা দান করলেন রামমোহন। তারপর আরও জটিল সামাজিক আবর্তের মধ্যে বিদ্যাসাগর তার ঋজু মেরুদণ্ড ও পরিচ্ছন্ন যুক্তিবিন্যস্ত কাঠামটি গড়ে তুললেন।

৩ Symonds : op. cit, pp. 10—11

হিউম্যানিস্ট পাণ্ডিত্যের স্বরূপ কি, এবং কেন বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বলা যেতে পারে, সে-কথা আশা করি বলতে পেরেছি। আজকের সমাজে শুধু 'হিউম্যানিস্ট' কথার বাইরের খোলসটুকু রয়েছে, তার সারটুকু চলে গেছে। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন "হিউম্যানিটিজ" বলতে কেবল গ্রীক-লাটিন ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা বোঝায়। সেই বিদ্যানুশীলনের মূলে যে 'হিউম্যান' বা মানবিক আদর্শের প্রেরণা ছিল, তা আর নেই। এখন শুধু ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার পণ্ডিত আছেন, 'এক্সপার্ট' বা বিশেষজ্ঞ আছেন। কোন আদর্শবাদী হিউম্যানিস্ট নেই। পেত্রার্ক বোকাচ্চো, এরেজমুস, চসার, কোলেট, টমাস মোরের যুগে তা ছিল না। আমাদের রেনেসাসের যুগেও 'পণ্ডিত' বলতে বিদ্যাসাগরের মতন হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বোঝাত। তাঁদের বিদ্যাসাধনার উদ্দেশ্য ছিল মানবমুক্তি। এরকম দু'একজন পণ্ডিত নন, বহু পণ্ডিতের কঠোর সাধনায় মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধ-বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মানবমনের ও মানববুদ্ধির মুক্তি সম্ভব হয়েছে। সিমণ্ডসের ভাষায় বলা যায় : ৪

. . . . scores of scholars, *men of supreme devotion* and of *mighty brain*, whose work it was to ascertain the right reading of sentences, to accentuate, to punctuate, to commit to the press, and to place beyond the reach of monkish hatred or of envious time that everlasting solace of humanity which exists in the classics . . . .

নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় নবযুগের ঊষাকালে explorer-রা যেমন দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন, হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরাও তেমনি হারিয়ে-যাওয়া পুঁথিপত্রের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যকে অবিকৃত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা, তার বিকৃত টীকা-টিপ্পনি ও অপব্যাখ্যাকে বাতিল করে আসল বস্তুর পাঠোদ্ধার কর সঠিক ব্যাখ্যা ও টীকা করা—এই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনাও প্রধানত এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পুনরুদ্ধার, টীকা-ব্যাখ্যা ছাড়াও তিনি মাতৃভাষায় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ করেছিলেন এবং তারই সার সংগ্রহ করে নবযুগের শিক্ষার উপযোগী সব পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। কেবল তাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। রামমোহনের মতন বিদ্যাসাগরও আরও দ্বিগুণ উৎসাহে, অজিত শাস্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সামাজিক আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছিলেন। তার প্রচারের জন্য নিজে ছাপাখানা স্থাপন ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। পণ্ডিত পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রবিদ্যা তিনি নির্ভয়ে জনসমাজে প্রচার করেছিলেন। এটা তাঁর সাহিত্যকীর্তির বড় দিক।

বিদ্যাসাগরের এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যাদর্শের কথা মনে না রাখলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। তাঁর পুঁথি-সন্ধান ও সম্পাদনা, অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সামাজিক আলোচনা মিলিয়ে তাঁর যে বিচিত্র সাহিত্য-সাধনা, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য-বিচার ও যথার্থ মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হব, তাঁর সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে। এই সাধনার ও আদর্শের সামান্য আভাস দিচ্ছি এখানে।

৪ Symonds : op. cit. pp. 9—10

তাঁর সম্পাদিত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

. . . . manuscripts of the work are very rare . . . . the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence . . . . by good fortune I procured three manuscripts from Benares . . . . after carefully collating them with the texts in Calcutta . . . . I have been able to edit the work.

'মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মুমুয়ীনগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীটীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই তিনখানি ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারিপুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল।"

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়, তখন স্থির হয় যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই নাটকের যে পাঠ প্রচলিত আছে তাই ছাত্রদের পাঠ্য হবে। বিদ্যাসাগরের উপর এই পাঠ রচনার ভার দেওয়া হয়। পূর্বে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই নাটকের যে দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, তা গৌড়দেশীয় সংস্করণ। ভূমিকায় বিদ্যাসাগর এ-সম্বন্ধে লিখেছেন : "এদেশে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রচলিত পুস্তকের প্রচার নাই।···আমি কার্যবশতঃ গত ফাল্গুন মাসে বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরী নিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্রের সহিত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয় দয়া করিয়া, স্বীয় পুস্তকালয় হইতে আমায় তিনখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকৃতি দিয়াছিলেন। অনন্তর, কলিকাতা সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর উদ্যোগে, বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতেও দুইখানি মূল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকৃতি অবলম্বন-পূর্বক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্করণকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।"

মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত 'হর্ষচরিতম্' গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরমবন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে একখানি পুস্তক দেখাইয়া কহিলেন, শ্রীযুত শেখ শাস্ত্রীনামে এক পণ্ডিত, পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায় আমার নিকট এই পুস্তকখানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্ট প্রণীত·····। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইলাম।···কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।"

ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্ককে 'the first of the humanists' বলে অভিনন্দিত করা হয়, কারণ সিমণ্ড্স বলেছেন :

In the susceptibility to the *melodies of rhetorical prose*, ... in the passion for collecting manuscripts, and in the intuition that the future of scholarship depended upon the resuscitation of Greek studies, Petrarch initiated the . . . . most important momenta of the Classical renaissance.

যে কয়েকটি কারণে পেত্রার্ককে নবযুগের প্রথম হিউম্যানিস্ট বলা হয়েছে ঠিক সেই সব কারণেই বিদ্যাসাগরকে বাংলাদেশের 'প্রথম' না হলেও, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বলা যায়। বিদ্যাসাগরের "melodies of rhetorical prose" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় : "গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

পেত্রার্ক, বোকাচ্চো, এরেজমুস, এদের পুথিপত্র পুনরুদ্ধারের কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কারণ কাহিনীর গভীর তাৎপর্য জন্ অ্যাডলিংটন সিমণ্ড্স, জেকব বুর্খার্ট, হুইজিঙ্গার মতন রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকরা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের রেনেসাঁসের যুগের ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়নি আজও, তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতন হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের দানের তাৎপর্য আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। 'হর্ষচরিতে'র পুথি পেয়ে বিদ্যাসাগর যখন বলেন : "কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম"—তখন আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনা, তাঁর এত আহ্লাদ ও আগ্রহের কারণ কি, তার প্রেরণাই বা কোথায়? আরও অবাক লাগে এইকথা ভেবে যখন মনে হয়, তিনি তো কেবল বিদ্যার সাধনায় ধ্যানস্থ হতে অথবা প্রাচীন পুথির সন্ধানে মত্ত হয়ে যেতে পারেন নি, ইয়োরোপের হিউম্যানিস্টদের মতন? এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ও সামাজিকপ্রথার ব্যাপক সংস্কারের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার রূপ দিয়েছেন। তার মধ্যে ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৌধনির্মাণের পরিকল্পনা ও উপকরণ-সংগ্রহ করেছেন। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের যুগের কোন হিউম্যানিস্টের পক্ষে একাধারে এতগুলি কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়নি। হয়ত চারশ বছর আগে, তাঁদের কালে, তা পালন করা সম্ভবও ছিল না। তা না থাকলেও, বিদ্যাসাগরের পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিল, এদেশের এত সঙ্কীর্ণ সামাজিক পরিবেশে জন্মে, সেইটাই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়।

সাহিত্য কি তা না জানলে এবং সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ না দিলে, সাহিত্যিক রুচিবোধ জাগিয়ে না তুললে, সাহিত্য-রচনার বা সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা কল্পনা করা বৃথা। মধ্যযুগের অত্যধিক আধ্যাত্মিকতার ও নীতিকথার প্রভাবে সাহিত্যের এই রসাস্বাদন ব্যাহত হত। সাহিত্য, শিল্পকলা, সবকিছুর সৌন্দর্য ছিল আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তাদের নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল গৌণ। আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ তখন 'পাপ' বলে গণ্য হত। এই অবস্থায় সাহিত্যের নতুন ভিত-রচনা করতে হলে, সাহিত্যের আদর্শকে প্রথমে সকলের সামনে

তুলে ধরা দরকার। বিদ্যাসাগর কয়েকটি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-দর্শন এদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত করে, সেই প্রাথমিক কর্তব্য পালন করেছিলেন। "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে" সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করে, তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্ভারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রাদেশিক মাতৃভাষার সমৃদ্ধি এবং সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্যই যে বিশেষ করে ক্লাসিকাল সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ও প্রাচীন সাহিত্যের সমুদ্র-মন্থনের প্রয়োজন, 'প্রস্তাবের' মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করতেও তিনি ভোলেন নি। কেবল ইঙ্গিত করে বা নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। ব্যাকরণের বিভীষিকা থেকে সংস্কৃত ভাষাকে তিনি মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ছাত্রজীবনে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে তাঁর নিজেরই যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তিনি ভোলেন নি। বাংলা মাতৃভাষায় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' রচনা করে তিনি দেবভাষার গোপন চাবিকাঠিটি সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এদেশের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এত গভীরভাবে চিন্তা করেও বিদ্যাসাগর নতুন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা বিস্মৃত হন নি। অসীম আগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাই থেকে নানাবিধ রত্ন আহরণ করে 'কথামালা' 'বোধোদয়' 'জীবনচরিত' 'চরিতাবলী' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। রচনাকালে নতুন বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দও তাঁকে সন্ধান ও সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সংস্কৃত শব্দও তিনি যথেষ্ট সংগ্রহ করেছিলেন বাংলাভাষার পরিপুষ্টির জন্য। কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্তে 'তদ্ভব' ও 'দেশজ' শব্দের প্রয়োগের দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর 'শব্দমঞ্জরী' ও 'শব্দসংগ্রহ' নামে দুটি অভিধানের পরিকল্পনা তার সাক্ষী। দুঃখের বিষয় দুটি অভিধানের একটিও তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ-পটুতা ও যুক্তিবিন্যাস-দক্ষতার বিস্ময়কর প্রকাশ হয়েছে। গভীর হৃদয়াবেগ ও মানবিক প্রেরণার স্পর্শে তাঁর সামাজিক আলোচনা ও সমালোচনাও অনেকক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত তাঁর পরিহাস-পটুতা, প্রখর বিদ্রূপ ও শ্লেষবোধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' জনসনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্যপ্রসঙ্গে বলেছেন: "জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জন্‌সনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতেষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন।" তারপর তিনি দুঃখ করে বলেছেন: "আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না।" বিদ্যাসাগরের সামাজিক রচনা, বাদ-প্রতিবাদ, উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি পড়তে পড়তে সত্যি মনে হয়, যিনি লেখনীতে এই বিদ্রূপ শ্লেষ ও পরিহাস ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, না-জানি মৌখিক ও বৈঠকী

আলাপ-আলোচনায় কি অজস্র ধারায় তার প্রকাশ হত। এই বিদ্রূপ ও শ্লেষের বিকাশ "ব্যক্তিস্বপ্রধান" সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। অর্থাৎ প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই সমাজে ও সাহিত্যে শ্লেষ পরিহাস ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিকাশ হয়েছে। জেকব বুর্খার্ট তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস-গ্রন্থে 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ' প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে মধ্যযুগেও হাসিতামাসা, বিদ্রূপ, শ্লেষ-রসিকতা সবই ছিল—'. . . but wit could not be an independent element in life till its appropriate victim, the *developed individual with personal pretensions*, had appeared.' মধ্যযুগেও শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কাব্য ছিল, কিন্তু সেই শ্লেষ বা বিদ্রূপের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বিশেষ হত না, কুলগত বৃত্তিগত বা জাতিগত অভিব্যক্তি হত। বুর্খার্ট বলেছেন: ৬

> The middle ages are also rich in so-called satirical poems; the satire, however, is not personal, but is aimed at classes, professions, and whole populations, and it easily assumes the didactic tone.

নবযুগের সমাজে অহম্‌সর্বস্ব ব্যক্তির আবির্ভাব হল যখন, তখন তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপেরও পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। সাহিত্যেও তার প্রকাশ হল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত তার একটানা স্রোত বয়ে গেছে। এই বিদ্রূপের জোয়ারের মধ্যেই প্রথম বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। প্রহসনের ভিতর দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যেরও বিকাশ হয়েছে। বাংলা আলোচনা-সাহিত্যেও যে তার তীব্র দ্যুতি কি ভাবে বিকীর্ণ হয়েছে, 'বিধবাবিবাহ' 'বহুবিবাহ' ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লক্ষনীয় হল, 'বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তকের' গোড়াতেই বিদ্যাসাগর এই নতুন ভঙ্গি ও লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন: "এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র-বিচারে এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।" কিন্তু অবগত হবার পর তিনি নিজে তাঁর পরবর্তী রচনাবলীতে, বিশেষ করে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি ছদ্মনামে রচিত গ্রন্থে, তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তিতে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা তাঁর সমকালীন গদ্য-রচনায় দুর্লভ। এই বাদ-প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে স্বভাবতঃই বাংলা গদ্যভাষা প্রচুর জীবনীশক্তি আহরণ করে, তাঁর হাতে সতেজ সচল ও সবল হয়ে উঠেছে এবং তার অসংযত ও অবিন্যস্ত রূপকে তিনি সংযত ও সুবিন্যস্ত করতে পেরেছেন। ‡

৬ J. Burckhardt. The Civlisation of the Renaissance in Italy: pp. 93—100

‡ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্‌যাপিত বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতা। ছায়াভাষা হলঘরে ৩০ জুলাই, ১৯৫৭, মঙ্গলবার প্রদত্ত।

ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা

সোমেন বসু

ত্রিপুরার রাজবংশ স্মরণাতীত কাল থেকে রাজত্ব করে আসছেন। রাজত্বের আয়তন চিরকাল সমান ছিলোনা। কিন্তু অন্যান্য রাজ্য ও শক্তিগুলির সঙ্গে কখনো মৈত্রীভাব কখনো বৈরীভাব পোষণ করে ত্রিপুরার অধিপতিরা নিজেদের একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন পূর্বভারতের রাজনৈতিক তরঙ্গপ্রবাহের মধ্যে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পূর্বভারতের অন্যান্য শক্তি ও সভ্যতাগুলির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো। ত্রিপুরার পার্বত্য রাজদরবারে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি মধ্যযুগে ছিল কিনা বা থাকলে কতটা ছিল তা আজ সঠিক জানবার উপায় নেই। মহারাজ ধন্যমানিক্যের আমল থেকে 'রাজমালা' লেখানো হচ্ছে, মহারাজ রত্নমানিক্য বাংলা থেকে 'সুকর্ণ'-পুঁথিলেখক নিয়ে গিয়েছিলেন একথা রাজমালাতেই আছে। রাজমালার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই এবং তা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় তা রাজমালা আলোচনা করলে দেখবো। তবু মহারাজ ধন্যমানিক্যের আমল থেকে যে সব মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে তার সবগুলিই বাংলা অক্ষরে লেখা, প্রাচীন শিলালিপিগুলিও সংস্কৃতে রচিত কিন্তু বাংলা হরফে লেখা।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, মহারাজ জগৎমানিক্যের আদেশে রচিত গ্রন্থ পাওয়া গেছে। সেই গ্রন্থগুলিতে কবি ও লেখকেরা স্পষ্টই বলেছেন যে রাজ অনুরোধে তাঁরা সাধারণ লোকের বোঝবার জন্য কাব্য লিখেছেন বাংলা ভাষায়। গোবিন্দমানিক্যের একটি তাম্রলিপি বাংলাতেই লেখা।

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখি এই প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করেছেন ত্রিপুরার নরপতিরা। সমস্তই বাংলায় লেখা, এবং যাবতীয় রাজকার্য বাংলা ভাষাতেই চলেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি পত্রে লিখেছেন। "Tripura has been a state which has beenusing Bengali as the language of administration for quite a long number of years. In fact the Tripura ruling house switched on to Bengali at least from the middle of 14th century. They have developed a very vigorous and beautiful style on Bengali for transacting state business.

শুধু মুদ্রা নয়, শুধু শিলালিপি নয়, শুধু আদেশ পত্র নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ছাপা হয়েছে। মহারাজ রাধাকিশোর এক সময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে ইংরাজীর প্রতি একটা বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি ঐ ইংরাজীয়ানার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি এক বিশেষ আদেশ জারী করে বাংলা ভাষাকে রাজকার্যের ব্যবহারের জন্য অত্যাবশ্যক করে তুললেন। তাঁর মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে যা বলেছিলেন তা মনে রাখবার মতো—"এখানে আবহমানকাল রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত

ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় এবং তৎপক্ষে বেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরঘোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

অবশ্য রাজ্যে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে রাধাকিশোর প্রথম নন। বীরচন্দ্র আইন করে বাংলা ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলেন। পার্বত্যজাতিসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচারের চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছিল।

মহারাজ রাজধরমাণিক্যের আমলের মুদ্রা বাংলা হরফে লেখা—"শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্যদেব শ্রীসত্যবতী মহাদেব্যৌ।"—এ মুদ্রার সময় ১৫০৮ শকাব্দ। বাংলা হরফে বাংলা ভাষায় অন্য কোন মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে তো জানি না। এ ছাড়া রাজাদের অনেক দানপত্র বাংলায় লেখা—১৬১৩ খৃঃএ গোবিন্দমানিক্যের বাংলায় লেখা একটি দানপত্রের প্রতিলিপি নিম্নরূপ—

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষমসমরবিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামা···রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মৌজে পাঁচথুপি ।···ভূমি ব্রহ্মোত্তর কামদেব পণ্ডিত পাইছিল অথনে সেই ভূমি বেটা শ্রীজা···পণ্ডিতেরে দিলাম। প্রিতে ব্রহ্মোত্তর এইভূমি নিজ হাতে হালে চাষ করিঅ, সুখভোগ করৌক।···

কর্ণেল মহিম ঠাকুর তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা অক্ষরে লেখা গোবিন্দমাণিক্যের মোহর দেখলেন সেইদিনই আনন্দে অধীর হয়ে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে বাংলা ভাষা প্রচার সমিতির পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র থেকে সুরু করে মহারাজ বিক্রমচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত অসংখ্য রোবকারী বাংলা ভাষায় জারী করা হয়েছিল। সেই সবগুলি একত্র মুদ্রিত করতে পারলে দেখা যাবে যে বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে সরে থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যে এক অতি বলিষ্ঠ বাংলা গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা বাংলাভাষার প্রকাশ ক্ষমতা সম্বন্ধে আজও কোন সন্দেহ পোষণ করেন তাঁরা এই আদেশনামাগুলি ভাল করে অনুধাবন করলে উপকৃত হবেন। আরও লক্ষণীয় এই যে এই বাংলা গদ্যভঙ্গী যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা ছুৎমার্গবাদী ছিলেন না। তৎসম শব্দছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা চলবে না এই সংকীর্ণতা তাঁদের ছিলনা। তাঁরা স্বচ্ছন্দে খানদানী, দরমাহা, রোবকারী, ইস্তমেজাজ প্রভৃতি ফারসী শব্দ আর ট্রেজুরী রিপোর্ট, বজেট, কমিটি প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করেছেন।

আধুনিককালে ভারতবর্ষ হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করেছে। সে ভাষা নতুন করে রাজকার্যের উপযোগী করে গড়ে তুলতে গিয়ে উদ্যোক্তারা যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছেন তা অল্প নয়। প্রকাশের দিক থেকে হিন্দী যে বাংলার চেয়ে দুর্বলতর এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামের দ্বারা বাংলাকে রাজভাষা বলে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু সেখানেও রাজকার্যের উপযোগী বাংলা ভাষা নতুন করে সৃষ্টি করতে হচ্ছে। সুনীতিবাবু তাঁর ঐচিঠিতে বলেছেন We are trying to establish a

kind of administrative or official Bengali and we are blundering onwards. So it is also being attempted for Hindi and other Indian Languages and East Pakistan will ere long be trying to do the same thing for Bengali. I think if the Tripura State could publish a comprehensive volume of the State documents showing how Bengali has actually been in administration, it will be of in estimable value for the entire Bengali people, whether of Pakistan or of India and for two administrations—that of West Bengal and that of East Bengal as in Pakistan.

ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাস স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্তব্য প্রজাকে পালন করা তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে, কোন দিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।'

রাজতন্ত্রের দিন অবসিত হবার পর যাঁদের হাতে ত্রিপুরার শাসনভার পড়েছে তাঁরা এই অমূল্য সম্পদের মূল্য বোঝেন নি। তাই সুনীতিকুমারের এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে কোন উৎসাহ দেখা দেয়নি। ত্রিপুরার স্বাধীনতার দিনে যাঁরা ত্রিপুরা শাসন করতেন তাঁরা যে সবাই সাধুপুরুষ ছিলেন তা নয় কিন্তু অনেকেরই দেশের জন্য সত্যকার আকর্ষণ ছিল। আর এখন যাঁরা ত্রিপুরার শাসকবর্গ তাঁরা হিন্দী প্রচারের জন্য যতটা উঠে পড়ে লেগেছেন তার কণামাত্র উৎসাহও ত্রিপুরার রাজভাষার নিদর্শনগুলি রক্ষা করার জন্য দেখান নি। বর্তমান ত্রিপুরার সরকার এই সব রাজাদেশগুলি সংকলিত করে প্রকাশ করবেন সে আশা সুদূরপরাহত! বাংলা ভাষাকে যাঁরা ভালবাসেন, যাঁরা বাংলা ভাষার বিচিত্রতর প্রকাশভঙ্গী দেখে গর্ববোধ করেন তাঁদের জন্য কয়েকটা রোবকারী আমরা তুলে নিচ্ছি।

এই রোবকারীগুলি বিভিন্ন সময়ের। ১৮৮২ খৃঃএ মহারাজা ঈশান মাণিক্যের রোবকারী থেকে সুরু করে ১৯৪১ এ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পর্য্যন্ত আশী বছরের রাজাদেশ এইগুলি। বিভিন্ন ধরণের আদেশ আমরা উদ্ধৃত করছি যার ফলে পাঠক বুঝতে পারবেন রাজভাষা হিসাবে বাংলার প্রসার কত বিস্তৃত ছিল।

॥ ১ ॥ রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা
হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।
ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয়

কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ, ৺ইচ্ছাধীন কোন সময়ে প্রাণবিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই। এ মতেই এ পক্ষের খানদানের চিরন্তন রীতি মতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সে মতে হুকুম হইল যে—

যুবরাজী পদে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্রঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথমপুত্র শ্রীলশ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তাপদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্রঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিতা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীল শ্রীযুক্ত জজ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।

মোকাবিলা—শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন পেস্কার শ্রীশ্রীসহী মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত মোহরের কারো কারো অভিমত এই রোবকারী আসল নয় জাল। সে তর্কে আপাততঃ আমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে জাল হলেও ঐ তারিখেই বা তার ছচার-দিনের মধ্যেই হয়েছে। সুতরাং এ রোবকারী যে আজ থেকে প্রায় পঁচানব্বই বছর আগেকার বাংলাকে বহন করছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। ঈশানমাণিক্যের গুরু ঐ সময় রাজ্যপরিচালনা করতেন। তিনি নাম সই করতেন না "শ্রীশ্রীসহী" লিখতেন। তাঁরই স্বাক্ষর "শ্রীশ্রীসহী"।

॥ ২ ॥ (Sd) B. C. Deb
রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।
সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্বতীয় প্রদেশের কোন কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সে মতে—
হুকুম হইল যে,—
এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘণক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়। (স্বাক্ষর) প্যারীমোহন রায় মুন্সী

॥ ৩ ॥ নং ১ (sd) R. K. Deb Barman.
রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ
যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ২৮শে অগ্রহায়ণ।

স্বাঃ গোপীকৃষ্ণ দেব

যেহেতু গতকল্য অপরাহ্ণ ৩ তিন ঘটিকার সময় পিতৃদেব ৺ মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর

কলিকাতা মোকামে পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি থাকানের রীতি এবং এই রাজবংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যাজ্য জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও রাজসী ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার হইয়াছি। এখন হইতে রাজসী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে এ পক্ষের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ইতি মং (স্বাঃ) শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী কেরাণী।

॥ ৪ ॥ মেমো নং ৩০ (sd) R. R. Deb Barman.

শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের ২২শে চৈত্রের প্রস্তাবানুসারে বোর্ডিং খোলা সাপক্ষে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত ঠাকুর বংশীয় বালকগণকে শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩৲ তিনটাকা হইতে ৬৲ ছয়টাকা পর্য্যন্ত ২৫টি বৃত্তির বাবত মং ১০০৲ একশত টাকা এ পক্ষের ২৪শে চৈত্রের আদেশ দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি ছাত্রগণের প্রত্যেক মাসে শিক্ষার উন্নতি, উপস্থিতির সংখ্যা এবং সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে। উপযুক্ততানুসারে বৃত্তি বণ্টন ও রহিত করিতে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অধিকার থাকিবে। অতএব আদেশ

অবগতি ও আচরণার্থে ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি, হিসাব বিভাগ জেনারেল ট্রেজুরী ও শিক্ষা বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ২৩শে চৈত্র।

মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। ক্লার্ক

॥ ৫ ॥ মেমো নং ৩২ (sd) R. K. Deb Barman

সংসার বিভাগের হিসাবাদি কাগজাত পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইতেছে যে রাজ্যের আয়ের তুলনায় সংসার বিভাগের ব্যয় নিতান্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখার এবং রাজ্যের ও রাজধানীর আবশ্যকীয় উন্নতিকার্য্যের জন্য সংসার বিভাগে যে সমস্ত অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকীয় ব্যয় আছে, তাহা রহিত করিয়া ১৩০৭ ত্রিং সনের বজেট প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারে এক্ষণ বার্ষিক যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হইতেছে, তন্মধ্যে অনাবশ্যকীয় ও অতিরিক্ত যে সকল ব্যয় আছে তাহা রহিত করিলে কোনরূপ অসুবিধা হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয়না। গৃহাদি প্রস্তুত ও ব্রতাদির ব্যয় ব্যতীত সঙ্গায় ফর্দ্দের লিখিত মতে শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারী বার্ষিক ব্যয় মং ২১২৩।০ আনা হইলেই নির্ব্বাহ হইতে পারে; তত্রাচ শ্রীশ্রীমতীর বিশেষ সুবিধার জন্য উক্ত মঃ ২১২৩।০ আনার অতিরিক্ত আরও মং ৩৭৬৸০ আনা দিয়া বার্ষিক মং ২৫০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইল।

রাজপরিবারস্থ অপর সকলের বন্ধান এ পক্ষের স্বাক্ষরিত সঙ্গায় লিষ্ট অনুসারে করা হইল।

হুকুম হইল যে

অবগতি ও কার্য্যপরিচালনের জন্য এই মেমো ও তদ্বযতি ফর্দ্দ সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের নিকট পাঠান যায় এবং এই নিয়মে বজেট প্রস্তুত হয়।

ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তাং ২রা বৈশাখ মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। ক্লার্ক।

॥ ৬ ॥ মেমো নং ৫২ (sd) R. K. Deb Barman

এতৎরাজ্যে জোলাই শ্রেণীর অনেক প্রজা থাকা জানা যায়। তাহাদের সংখ্যা, জাতি, নিবাস কাহার জোলাই এবং তাহাকে কত কর দিয়া থাকে, কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য হইলে কি কার্য্যের জোলাই, সরকারে কোনরূপ কর দেয় কিনা এবং তাহাদের সমশ্রেণীর অপর প্রজার করের হার কি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যক অতএব—আদেশ হইল যে

সত্বর উল্লিখিত বিবরণ সমূহ সংগ্রহক্রমে রিপোর্ট করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ।

মং (স্বাঃ) শ্রীরামকমল চক্রবর্ত্তী।

॥ ৭ ॥ মেমো নং ৫৮ (sd) R. K. Deb Barman

জানা যায় অত্র রাজধানী, সহরতলী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের কিয়তকাল যাবত জ্বর রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যাহাতে সর্বসাধারণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে সত্বর তাহার বিশেষ উপায় অবলম্বিত হওয়া এ পক্ষ বোধ করেন অতএব—আদেশ

সর্ব্বসাধারণের চিকিৎসার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা এবং তদুপলক্ষে কোন বিশেষ বন্দোবস্তের আবশ্যকতা হইলে তৎসম্বন্ধে ষ্টেইট ফিজিসিয়ানের মত গ্রহণান্তে প্রস্তাব উপস্থিত করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট পাঠানো যায় ইতি সন ১৩০৭ ত্রিং তারিখ ২২শে জ্যৈষ্ঠ

মং (স্বাঃ) শ্রীরামকমল চক্রবর্ত্তী।

॥ ৮ ॥ মেমো নং ৭ (sb) R. K. Deb Barman

সংবাদপত্র পাঠে এবং জনশ্রুতিতে জানা যায় কলিকাতা নগরে 'বিউবণিক প্লেগ' নামক মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা এবং উদ্যম, সত্ত্বেও যখন এই ব্যাধি বোম্বাই অঞ্চল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত পহুঁচিয়াছে তখন ইহা অচিরে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া এ রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে। ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই এতৎ সম্বন্ধে যথোচিত উপায় এবং সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া একান্ত সঙ্গত বোধ হইতেছে। অতএব

আদেশ

যাহাতে উক্ত মহামারী এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে একান্ত প্রবেশ করিলেও যাহাতে উহা বিস্তৃত এবং সংক্রামক হইতে না পারে তাহার উপায় স্থিরীকরণ এবং এ পক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণে তাহা কার্য্যে পরিণতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণদ্বারা একটি প্লেগ কমিটি গঠিত করা যায়। কমিটির সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি এবং আর একজনকে সম্পাদক মনোনীত করিতে পারিবে। আগামী ২৮শে বৈশাখ কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে। কমিটির প্রত্যেক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীর নকল এ পক্ষ সাক্ষাৎ প্রেরণ করিতে হইবে। অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি কমিটির সভ্যগণ নিকট এবং অবগতির কারণ সংশ্লিষ্ট অফিসধ্যক্ষে প্রেরিত হয় ইতি।

সন ১৩০৮ ত্রিং ২৫শে বৈশাখ মং (স্বাঃ) শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, কেরাণী।

কমিটির সভ্যগণের নাম

১। শ্রীরাজা মুকুন্দরাম রায় ২। শ্রীগোপীকৃষ্ণ ঠাকুর ৩। শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুর ৪। বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ৬। শ্রীবিপ্রচরণ নন্দী ৭। শ্রীকৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস ৮। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র ৯। শ্রীবন্ধুবিহারী মিত্র ১০। শ্রীপরেশ নাথ মুখার্জ্জী ১১। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী ১২। শ্রীরামসুন্দর দে ব্যাপারী।

রোবকারী নং ৬ (sd) R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,

স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং ৫ই ভাদ্র

যেহেতু সদর নেইলের কয়েদী শ্রীরমনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচৈনন্দি জেইলে আগত হওয়ার অল্পকাল পর হইতে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং এইক্ষণ ষ্টেট ফিজিসিয়ানের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে তাহাদের জীবন সন্দিগ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত কয়েদীদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত সেমতে। হুকুম হইল যে

উল্লিখিত রমনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচৈনন্দি কয়েদীদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া যায়। এই আদেশ অগৌণে কার্য্যে পরিণত হয়। মং (স্বাঃ) শ্রীমহেশচন্দ্র ভৌমিক।

॥ ১০ ॥ ৭নং (sd) R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,

রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১১ ত্রিং তারিখ ৫ই ভাদ্র

যেহেতু রাজপরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অথবা শ্রীপাটের কেহ কাহারও নিকট হইতে কর্জ্জ করিলে টাকা উশুলের কার্য্যে নানারূপ অসুবিধার বিষয় ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ এ পক্ষের বিনানুমতিতে রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহ টাকা ধার কর্জ্জ লওয়া এ পক্ষের একেবারেই অভিপ্রেত নহে, অতএব— আদেশ হইল যে

এ পক্ষের অনুমতি ভিন্ন রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহই টাকা কর্জ করিতে পারিবেন না এবং কাহারও পক্ষে তাঁহাদিগকে কর্জ্জ এবং জিনিষাদি ধার দেওয়াও সঙ্গত হইবে না এবং তদ্রূপ করিলে তাহার নালিশ এ পক্ষের গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ উজীর নিকট পাঠানো যায়। ইতি মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। হেডক্লার্ক

॥ ১১ ॥ মেমো নং ১৪ (sd) R. K. Deb

যেহেতু শ্রীমান যুবরাজের শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে বার্ষিক বন্ধন নির্দ্দিষ্ট থাকা সঙ্গত অতএব আদেশ হইল যে শ্রীমান যুবরাজের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যয় বাবত বার্ষিক ২৫০০০৲ হাজার টাকা মঞ্জুর করা গেল। এই হারে বর্ত্তমান বৎসরের পৌষ মাস হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্যয় চলিবে। কোন মতেই মঞ্জুরীকৃত

টাকার অতিক্রম করা সঙ্গত হইবে না। কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই কাগজ মন্ত্রী অফিসে পাঠান যায়। ইতি ১৩১১ ত্রিং ২রা ফাগুন মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী। হেডক্লার্ক

॥ ১২ ॥ মেমো নং ৭ (sd) R. K. Deb Barman

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর,

রাজধানী আগরতলা ইতি সন ১৩১২ ত্রিং তাং ২৫শে আশ্বিন

যেহেতু পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমার বিচারে সেসন আদালত কর্ত্তৃক ১নং বিবাদীর প্রাণদণ্ডের এবং ২নং বিবাদীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হওয়ায় বিবাদীদ্বয় খাস শ্রীশ্রীযুত সরকার আপীল দায়ের করিয়াছে এবং বর্ত্তমান শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে বাহাদুর পক্ষে মদন প্রোক্ত খাস আপীল আদালতের জনৈক বিচারপতি শ্রীযুত রাজা মোহন লস্কর হেড কং মুকুন্দরাম রায় পৌড়া প্রযুক্ত কার্য করিতে অক্ষম বিধায় এই মোকদ্দমার বাদী-১নং ছেয়াদালী বিচার কার্য্য সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করার জন্য খাস আপীল আদালত ২নং গামরদী বিবাদী হইতে ইন্তমেজাজ আগত হইয়াছে, অতএব আদেশ

মোঃ জানকৃত বধ শ্রীযুত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর স্থায়ী বিচারপতি শ্রীযুক্ত দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, র সহিত নথী আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবে। অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট আদালত ও ব্যক্তিগণ নিকটে পাঠান যায়; মং (স্বাঃ) শ্রীমনোমোহন চৌধুরী ক্লার্ক।

॥ ১৩ ॥ মেমো নং ১৫ (sd) B. Manikya

এ পক্ষের ১৩১৯ ত্রিং ২৩শে কার্ত্তিকের রোবকারির অনুস্থিতিতে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ মন্ত্রীর তন্‌খা ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করা গেল উক্ত তনখা গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে তিনি পাইবেন। ইতি ১৩১৯ ত্রিং তারিখ ২৮শে পৌষ।

॥ ১৪ ॥ মেমো নং ৯ *(sd) B. Manikya 7. 1. 22.

ঠাকুর লোকের মাধ্যে যাহারা কারবার কিংবা অন্য কোন ব্যবসায়ক্ষম এবং যাহারা কারবার করে তাহাদিগকে সংসার আফিস হইতে দরমাহা দেওয়া সঙ্গত নহে, ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব আদেশ হইল যে

ঐ প্রকার লোকের দরমাহা বন্ধ করা যায়, ইতি ১৩২২ ত্রিং তারিখ ৭ই বৈশাখ। মং (স্বাঃ) শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, পার্সনেল ক্লার্ক।

॥ ১৫ ॥ রোবকারী নং ৮ (sd) B. Manikya 22. 11. 28

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩২৮ ত্রিং ২০শ ফাল্গুন

যেহেতু শ্রীল শ্রীমান যুবরাজের শুভ উপনয়নোপলক্ষে নিম্নলিখিত ৫ পাঁচজন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর যাবজ্জীবন (২০ বৎসর) কারাদণ্ড ভোগের স্থলে তদর্দ্ধেক (১০ দশ বৎসর) কমাইয়া দেওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। অতএব—আদেশ হইল যে

নিম্নলিখিত পাঁচজন কয়েদীকে অস্থ মুক্তি দেওয়া যায় এবং অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর কারাদণ্ড ভোগের ২০ বৎসর ভোগের মধ্যে দশ বৎসর মাপ দেওয়া যায়, অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই রোবকারীর প্রতিলিপি চীফ দেওয়ান সমীপে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩২৮ ত্রিং ২২শে ফাল্গুন মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী পেস্কার

১। গোনাগ্রাম মালী ২। হরিরায় ত্রিপুরা ৩। আবদুল রহিম কাজি ৪। এতিম আলি ৫। গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

॥ ১৬ ॥ মেমো নং ৮

দরবারে একই প্রকারের নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহৃত হওয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের অভিপ্রেত ; অতএব সকল দরবারীদেরই কাল আচকান, সাদা চুড়িদার পায়জামা, সাদা পাগড়ী ও মোজা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হইবে। এবম্প্রকারের পোষাক গার্ডেন পার্টি' এবং অন্যান্য ষ্টেট সংক্রান্ত সমারোহের কার্যস্থলেও ব্যবহৃত হইবে; কেবল মিলিটেরী এবং পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতির স্ব স্ব ইউনিফর্ম্ম ব্যবহার্য্য। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমো শ্রীযুক্ত চিফ দেওয়ান মহোদয় বরাবরে পাঠান যায়। ইতি

by order

22, 2. 18 (sd) Rana Bodhjung

Private Secretary

॥ ১৭ ॥ (sd) B. K. Manikya 2. 9. 29

যেহেতু মহামান্বিত ভারত সরকারে প্রতিকূলে আফগানিস্থানের আমীর কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া এ পক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে ; অতএব এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে এ রাজ্যে কোন আফগান প্রজা বা আফগানিস্থানের অধিবাসী সাময়িকরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে দৃষ্ট্যধীনে রাখিতে হইবে অতঃপর এরূপ ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ তৎপরতার সহিত রেজেষ্টরী করতঃ তদীয় গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ত্রিং ২৯শে বৈশাখ মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী পেস্কার।

॥ ১৮ ॥ মেমো নং ৬ (sd) B. K. Manikya 7. 8. 29.

বিগত পরশ্ব দিবস দেওয়ান শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরী কাছারীর সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চাটার্জ্জী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে মারিয়াছে। অস্থ যে কোন পন্থাবলম্বনে শান্তি করার প্রয়াসী না হইয়া ব্রাহ্মণকে রাগান্ধ হইয়া এরূপভাবে উর্দ্ধতন কার্যকারকের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত কার্য করা হইয়াছে। অতএব আদেশ হইল যে,

দেওয়ান শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরীকে উল্লিখিত গহিত কার্যের দরুণ একমাসের জন্য সসপেণ্ড করা যায়। কার্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ত্রিং তারিখ ৭ই অগ্রহায়ণ মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী পেস্কার।

॥ ১৯ ॥ মেমো নং ১ (sd) B. K. Maniky 29. 2. 33

শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী শশীমোহন দেববর্ম্মার পক্ষে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন :—

ললিতলতিকা দেবীর আবেদন ও চীফ সেক্রেটারীর মন্তব্য আলোচিত হইল।

দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহার পিতার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সরকারী কার্য্যোপলক্ষে শোচনীয় মৃত্যুর বিষয়ে স্মরণ করিয়া আমি তাহাকে মার্জ্জনা করিলাম। অতঃপর শশীমোহন দেববর্ম্মা সদর ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া কারামুক্ত হইবে। ইহার বিরুদ্ধে আর ফৌজদারী মোকদ্দমা স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। মোট তছরূপি টাকার পরিমাণ, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন কর্ম্মচারীর দায়িত্ব ও আদায়ের উপায় সম্বন্ধে, রাজমন্ত্রী মন্তব্য উপস্থিত করিবেন। ইতি সন ১৩৪৩ ত্রিং তারিখ ১৯ জ্যৈষ্ঠ মং (স্বাঃ) দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, পার্সনেল ক্লার্ক।

॥ ২০ ॥ নং ২৫২ পদ্মমোহর স্বাঃ শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

দরবার-বিষম-সময়-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমন্ত বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী। ইতি

১৩২১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত ;—

যেহেতু মর্ত্ত্যদেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম' ঋষিরা কাব্যে ভিতর দিয়া ভগবদসত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অধুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃপ্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ ওণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায় তিনিই তরুণ রবিকে রাজ অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এপক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্যে রত হইবার গৌরবলাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর রাজের কর্ত্তব্য "জ্যোৎস্নাভিরাহৃত মন্ধদ্বয়াস্কারম্ ।"— অতএব

এই উৎসব চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত
কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে
"ভারত-ভাস্কর"
আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—
এবং
শ্রীভগবান তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে
শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

ভারতে জাতীয়তাবোধ উন্মেষণায়—ভগিনী নিবেদিতা

চিত্তরঞ্জন পাল

রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছেন লোকমাতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে তাঁর দানের সম্যক আলোচনা হয়নি আজও। যে বিদেশিনী মহিলা ভারত বাসীর সেবা ও কল্যাণকামনায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিলুপ্ত থেকে অত্যধিক পরিশ্রমে অকালে তনুত্যাগ করলেন ভারতেরই মাটিতে, তাঁর স্মৃতির প্রতি ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। পঞ্চাশ বছর চলে গেল। ভগিনীর উপযুক্ত মর্যাদা কতটুকু দিতে পেরেছি আমরা? বাগবাজারের নিবেদিতা লেন, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, দার্জিলিংয়ের অতি-সাধারণ স্মৃতি-সৌধ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক আধখানা কেতাবে তাঁর জীবনের তথ্যবিবৃতি। ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষণায় তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রেরণার মূল্য পর্যালোচিত হলনা উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে। শ্রীঅরবিন্দের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজনৈতিক জীবনের যিনি নেপথ্য প্রেরণা, তাঁর কোন পরিচয় মেলেনা পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে প্রকাশিত Sri Aravindo on Himself বইয়ে। শ্রীমনি বাগচীর "ভগিনী নিবেদিতা" কিছুটা ঋণশোধ। "যেমনি হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত কথা আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে; মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।" রবীন্দ্রনাথের মত মহামানব এমন অনুপম ভাষায় যাঁর মহিমা প্রকাশ করেছেন তাঁর জীবন-সাধনার আলোচনা জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আলোচনার প্রাক্কালে স্মরণ করি নিবেদিতার অকাল মৃত্যুতে টাউন হলের শোকসভায় সভাপতি রাসবিহারী ঘোষের আবেগ কম্পিত ভাষণ—"নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলিতে আমার বাধে। আমার তো মনে হয় তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেবায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম।.....যদি কোন ফুলের সহিত নিবেদিতার অন্তরের সৌন্দর্যের তুলনা দিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে যে ফুলটির নাম আমার মনে আসে তাহা হইল শ্বেত-পদ্ম। শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র ও পবিত্র ছিল তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি। তিনি পবিত্রতার মতই পবিত্র—যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। আমাদের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্মীয়রূপে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ভারতের পুনরুত্থানের ইতিহাসে নিবেদিতা নামটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"—সেই ইতিহাস জানবার আগে নিবেদিতার জন্ম, পরিবেশ, আদর্শ ও ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য জানা দরকার।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আলস্টার সহরে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে মার্গারেটের জন্ম ১৮৬১ সালের ২৮শে অক্টোবর। আইরিশ মুক্তি সংগ্রামের একাধিক বিপ্লবী মহানায়কের জন্মদাতা এই সহর। মার্গারেটের পিতামহ রেভারণ্ড নোবলও এমনি একজন জাতীয়তাবাদী বীর। বৈপ্লবিক মনোভাব ও সুগভীর দেশাত্মবোধ তাই মার্গারেটের গৌরবময় উত্তরাধিকার। মাতার

প্রথম সন্তান তিনি, জন্মের আগে দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন জননী ইসাবেল "প্রভু, আমার সন্তান যদি নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয়, দেবতার পায়ে নিবেদন করব তাকে।" সে প্রার্থনা সার্থক হয়েছে নিবেদিতার জীবনে। পিতার সংগে তিনিও যোগ দিলেন আইরিশ মুক্তি সংগ্রামে। নেতা পার্নেল ও মাইকেল ডেভিড। হোমরুল দাবির সেই বহ্নিগর্ভ আন্দোলনের মধ্যাহ্নে ছাত্রীজীবন শেষ করে মার্গারেট লণ্ডনে এলেন শিক্ষকতার ব্রত নিয়ে। সিসেম ক্লাব নামক প্রগতিশীল সংস্থা কর্ত্তৃক সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের তিনি হলেন অধ্যক্ষ। দেশসেবাও চলল একই তালে। পরিচয় হল জার-রাশিয়ার নামকরা সন্ত্রাসবাদী নেতা ক্রোপোটকিনের সংগে: সশস্ত্র বিপ্লবের পথে তিনি দেখলেন দেশের মুক্তির ইংগিত। মনে পড়ল পার্নেলের বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা—"আমরা এমন একটি সরকারের সংগে লড়াই করছি যে কেবল একটি মাত্র যুক্তি বোঝে—ক্ষমতার যুক্তি।" সশস্ত্র বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে উঠল সারা আয়ার্ল্যাণ্ডে। মার্গারেট ডুবে গেলেন দেশের কাজে। এমন সময় বিরাট পরিবর্ত্তনের ডাক এল তাঁর কানে।

বিবেকানন্দ বলেছেন "Nivedita is the fairest flower of my work in England" বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সংগে জাত-বিপ্লবীর এই মিলন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আধ্যাত্মিকতা এ মিলনের গৌণ কারণ। বিবেকানন্দের সেবাধর্ম ও মানবপ্রেমের আদর্শই মোড় ঘুরিয়ে দেয় মার্গারেটের চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শের। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র সার্থকতার সন্ধান পায় বিশ্বমানবতাবাদে।

রামকৃষ্ণের মত--যত্র জীব, তত্র শিব। যত পথ, তত মত। সব পথের শেষে একই সিদ্ধি। সমন্বয়ের সাধক তিনি। বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য। বিবেকানন্দ বীর্যবান সন্ন্যাসী। দেশের মুক্তি ও মানুষের দুঃখ মোচনই তাঁর সন্ন্যাসধর্মের আদর্শ। নব্য বাংলাকে সমাজবাদে দীক্ষাদান এই বীর ধর্মপ্রচারকের প্রধানতম কীর্ত্তি। ভারতের মুক্তি তাঁর জপের মন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম যেমন বাংলা দেশে দুকূলভাসানো ভাবের বন্যা এনেছিল, বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও তেমনি তন্দ্রাতুর জাতিকে উদ্বুদ্ধ করল বিপ্লবের বহ্নিমান চেতনায়। রোমাঁ্যা রলাঁ্যা কথাটি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—
The Indian Nationalist movement smouldered for a long time until Vivekananda's breath blew the ashes into flame and erupted violently three years after his death in 1905. It is an undoubted fact that the Neo-Vedanticism of Vivekananda materially contributed to this evolution.

[Prophets of New India, P-497]

বাংলার বিপ্লববাদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী দেশবাসীর সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ছিল এই সব অকুতোভয় বীরের সঞ্জীবনী মন্ত্র। তাঁর লেখা ছিল মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকদের অবশ্য পাঠ্য। বাংলার বিপ্লববাদের মুখপাত্র হিসাবে হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি লিখেছিলেন—
"Man-making is my mission of life, Hemchandra. You try with your comrades to translate this mission of mine into action and reality. Read Bankimchandra and emulate his Desha-Bhaki and Sanatana Dharma. Your duty should be service to the motherland. India should be freed politically first.

(Vivekananda : Patriot-prophet, P-304, By Dr. B. N. Datta).

দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত-আত্মা সুপ্ত আছে দরিদ্রের কুটীরে—The only hope of India from the masses. The upper classes are physically and morally dead. জনসেবা ও জনজাগরণ তাঁর জীবনের ব্রত। বিদেশী শাসন ও শোষণে দেশবাসীর একমাত্র অবলম্বন ছিল ধর্ম। বিবেকানন্দ তাদের চেতনার রাজ্যে মোহমুক্তির জোয়ার আনতে চাইলেন আধ্যাত্মিকতার পথে। তাঁর মানবপ্রেম-মূলক ধর্ম যুগধর্মেরই প্রতিফলন। বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবনের পতাকাবাহী নিবেদিতা।

লণ্ডনে স্বামীজির বক্তৃতা ও আলোচনা শুনে মুগ্ধ হন মার্গারেট। বোধিসত্ত্বের মত জগতের শেষ ধূলিকণাটির মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করার আকুতি জাগল তাঁর মনে। জগতের হিতে সেবাধর্মে দীক্ষিত হলেন তিনি। বিবেকানন্দ লিখলেন—"আমার আদর্শ ছকথায় বলা যায়। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে সমাজে তা প্রকাশ করা এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই দেবত্ব কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা।...বর্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন, অসার। জগতে এখন চরিত্র বলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব মানুষ চায় যাদের জীবন জগন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ সেই প্রেমের শক্তিতে উচ্চারিত বাক্য বজ্রের মত কাজ করবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে তোমার মন সব সংস্কার-মুক্ত। তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে যা পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে। এমনি আরও অনেক মানুষ আসবে। আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় পুড়ে মরছে। তোমার ঘুমানোর অবসর কোথায়। গুরুর বাণী নাড়া দিল মার্গারেটকে—মানুষের হিতব্রতই হল তাঁর বাকী জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য।

ভারতে এলেন তিনি। হ্যামুয়েল রিচমণ্ডের মেয়ে মার্গারেট বিবেকানন্দের সৃষ্টিতে রূপান্তরিতা হলেন ভগিনী নিবেদিতায়। তারিখ ২৫শে মার্চ, ১৮৯৮। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু স্বয়ং বিবেকানন্দ। গুরুর মন্ত্রে তিনি হলেন তাপসী অপর্ণা—"আমার জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ তোমাকে নিয়ে একথা মনে রেখে কায়মনোবাক্যে ভারতের সেবায় নিজেকে সার্থক ও সুন্দর করে সম্পূর্ণ করে তোলো। তোমার জপের মন্ত্র অন্য কিছু নয়, শুধু "ভারত" "ভারত"। নিবেদিতার মনে পড়ে গুরুদেবের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা—"আমার কথা ধরিতে গেলে আমি স্বদেশবাসিগণের উন্নতিকল্পে যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে দুইশত বার জন্ম-পরিগ্রহ করিব।" গুরুর ঘোষণা বার বার মনে পড়ে নিবেদিতার—"যে ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরা রুটি দিতে পারেন না, তিনি পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা।" গুরুর নির্দেশে সর্বতোভাবে ভারতীয় হবার সাধনা চলল নিবেদিতার। বিবেকানন্দের সঙ্গে সারা ভারত ঘুরলেন তিনি। তাঁর সেই আত্মদানমূলক তপস্যা সম্পর্কে সমালোচক-প্রবর মোহিতলালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"নিবেদিতার আত্ম-বিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন

এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় এবং দুশ্চেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হবার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে! ধর্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর গ্রহণকে কে কোথায় দেখিয়াছে?" এই অসম্ভবকে সম্ভব করাই নিবেদিতা চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই রহস্যসূত্রে নিবেদিতার গৌরবোজ্জ্বল ভারত-সেবার ইতিহাস বিধৃত। এ কথা স্পষ্টভাবে জানা না থাকলে বোঝা যায় না নিবেদিতাকে।

১৮৯৮ সালে কোলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় জনসেবায় নিবেদিতার প্রথম হাতেখড়ি। নিজের হাতে বাগবাজারের নোংরা গলির ময়লা সাফ করা, চাঁদা আদায় করা, অন্ত্যজের দুর্গতদের সেবায় উদ্বুদ্ধ করা, দেশব্যাপী প্রেরণা সৃষ্টি করা তাঁর ভারত সেবার প্রথম অধ্যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার স্বীকার করেছেন—"ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে আমি একটি জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি; তাহা হইল আত্মমর্যাদাবোধ। আমাকে ইতিহাস গবেষণার কার্যে প্রেরণা দেবার কালে তিনি আমাকে বলিয়াছেন—Never lower your flag to a foreigner. তাঁহার এই উপদেশ আমি জীবনে ভুলি নাই।" শুধু আচার্য যদুনাথ নন, তৎকালীন বাংলার বহু যুগন্ধর পুরুষকেই তিনি আত্মমর্যাদাবোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট মেয়েকে ইংরাজী শিখাবার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে গেলে নিবেদিতা প্রশ্ন করেন—"সে কী, ঠাকুর বাড়ীর মেয়েকে বিলিতি মেম বানাবেন?" "ইংরাজী ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফৎ যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষা।" "কিন্তু বাইরে থেকে কোন একটা জিনিষ মিলিয়ে দিয়ে লাভ কী? বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করিনা।" সেদিন নিবেদিতার উক্তির কোন প্রতিবাদ করেননি পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীয়ানা তারপর ক্ষুরধার সমালোচনা করেছে ভারতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার। নিবেদিতার সুমধুর চরিত্রের দীপ্ত-সমুন্নত মহিমা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনুপম ভারত-প্রেম কবিকে এতখানি মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল যে তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'র মূলচরিত্রের পরিকল্পনায় ছায়াপাত হয়েছে নিবেদিতা-চরিত্রের। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রণেতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা স্পন্দিত হইয়াছিল। গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাওয়া যায়। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশ-ম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন।" ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নিবেদিতার ভারতীয়ত্ব নিখাদ। ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসায় তাঁর হৃদয় কাণায় কাণায় ভরা। রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে ভ্রমণকালে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল দেশের সাধারণ মানুষ ও তাদের অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা। তাদের রান্নাঘর, ঢেঁকিশালা, গোয়াল ঘর সব কিছুতেই তাঁর সমান আনন্দ। সেকেলে কাঁথা দোলাই, কুলো-ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ ইত্যাদি পল্লী ও কুটীরশিল্পের অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি বিমুগ্ধ। বাংলার মন্দিরে মন্দিরে কাসর ঘণ্টার ধ্বনি, শান্ত অঙ্গনে তুলসীতলার সন্ধ্যাদীপের আলো, নোতুন ধানের স্বর্ণ মঞ্জরীতে কৃষাণীর আন্দোলিত কামনা—সবই তাঁর চোখে সুন্দর। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঙালী দেশের জিনিষে যে সৌন্দর্য

দেখতে ভুলে গিয়েছিল, নিবেদিতার রসজ্ঞান আবার তা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিল।" ভারত-শিল্পের-যুগান্তর-সাধনে নিবেদিতার দান তাই সসম্মানে উল্লেখযোগ্য।

ভারত-প্রেমিক ম্যাকস্‌মূলার ছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম অনুরাগী। এতবড় জার্মাণ মনীষীও একবার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, ভারতবাসী never excelled either sculpture or in painting. উক্তিটি ঐতিহাসিক সত্য না হলেও সাময়িক সত্য বটে। এবং সেই কারণের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্ট স্মিথ Imperial Gazetter এ সদর্পে লিখেছিলেন After 300 A. D. Indian sculpture properly so-called hardly deverses to reckoned as art. অজন্তা, ইলোরা, তাজমহল, কুতুবমিনার ইত্যাদিতে ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার কালজয়ী স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান থাকা সত্ত্বেও বিদেশীর মুখে এই কুৎসাবাদ কেন? কারণটি দুর্বোধ্য নয়। ভারত-শিল্পের প্রাচীন ধারা শুষ্ক-প্রায় হয়ে আসে ১৯শ শতকের মধ্যভাগে। প্রাক্ ইংরাজ যুগের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ইংরাজ আমলের পরবশতায় দেশীয় শিল্পের চর্চা এক রকম বন্ধ হয়ে আসে উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে। বিলাতী নীরস শিল্পের মোহ পরিধান ও রাজানুগ্রহকামী মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন, আক্রান্তও বিকারগ্রস্ত করে তোলে যে দেশীয় ললিতকলার গৌরবময় ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে বিদেশে তৃতীয়শ্রেণীর শিল্পের অনুস্তাবক ও অনুরাগীভক্ত হয়ে পড়েন তথাকথিত রসিকমহল। চিত্তবৃত্তির দীনতা ও সৃষ্টির অকিঞ্চিৎকরতা এমন স্তরে পৌঁছায় যেখানে স্বদেশীয়ানা অপরাধ। ভারত-শিল্পকে এই বন্ধ্যাত্বের কবল থেকে মুক্ত করে মহত্তর মহিমায় মণ্ডিত করেন অবনীন্দ্রনাথ। ভারত-শিল্পের এই নব জাগরণের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। হ্যাভেল উড্‌রফ্, টমসন ইত্যাদির তুলনায় নিবেদিতার কাছে ভারতবাসীর ঋণ বেশী।

অনুকরণের মায়াজাল থেকে ছাড়িয়ে এনে শিল্পীর রসদৃষ্টিকে তিনি নিবদ্ধ করালেন দেশের দিকে। শিখিয়ে দিলেন জাতির অগ্রগতির অভিযানে শিল্পের সহায়তা কত দরকার, শিল্পীর দায়িত্ব কত বিরাট। লেখনী তুলে নিলেন ভারত-শিল্পের প্রচারে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রাবলী। নিবেদিতার লেখা চিত্র-পরিচিতির বাংলা অনুবাদ করতেন রামানন্দবাবু স্বয়ং। নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে তিনিই পাঠালেন অজন্তায়। জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে এবং বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে স্বদেশী ধারার ছবি আঁকলেন নন্দলাল। অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতা" চিত্রের প্রেরণা যে স্বদেশী আন্দোলন তার অগ্রনায়িকা নিবেদিতা। তাঁরই উৎসাহ-দানের ফলে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা নবযুগ আনলেন ভারত-শিল্পে। তাঁরই প্রেরণায় আনন্দ কুমারস্বামী এগিয়ে এলেন সেই শিল্পের মহিমা-প্রচারে। নিবেদিতা না থাকলে সেদিন যেমন অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা ব্যর্থ হবার আশঙ্কা ছিল তেমনি হয়তো শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতেন না কুমারস্বামীর মত রসজ্ঞ ব্যক্তি। ডাঃ কুমার স্বামী লিখেছেন—"নানা প্রবন্ধ-পুস্তকাদির ভিতর দিয়া নিবেদিতা শুধু পাশ্চাত্য জগতের নিকটে ভারতের মুখপাত্রী হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এক অভিনব ছাত্রগোষ্ঠিকে যাহারা ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয় আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল।"

অসিতবাবু লিখেছেন—"আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাধবান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্‌সে যোগ না দিই। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নব জাগরণ নির্ভর করছে, সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে বড় কাজ—সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।" ভারত-শিল্পের এই যুগান্তর একটি মামুলী শিল্প-আন্দোলন নয়। প্যারিসের শিল্প মেলায় অবনীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি একটি পরাধীন জাতির নবতর আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-প্রত্যয়ের সোচ্চার স্বীকৃতি। আর কোন কারণ না হোক, এই একটি মাত্র কারণে নিবেদিতার কাছে ভারতবাসী চিরঋণী।

২৩শে অক্টোবর, ১৯০০ সাল। প্যারিসে বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের মেলা। প্রতিভার বিজলী-ছটায় দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন দেশের প্রতিটি বিজ্ঞান-সাধক। বিবেকানন্দের পাশে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা দেখলেন জগদীশচন্দ্র বসুকে। বাঙালী বিজ্ঞানীর কৃতিত্বে বিবেকানন্দ উল্লাসে আত্মহারা—নিবেদিতা বিস্ময়-বিমুগ্ধ! "এক যুবা বাঙালী বৈজ্ঞানিক আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্যকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় জগদীশ বসু ভারতবাসী, বঙ্গবাসী।" স্বল্পভাষী, নিঃসঙ্গ, খ্যাতি লোভহীন এই বৈজ্ঞানিকের সারা জীবনের শুভার্থিনী ও প্রেরণা-দাত্রী ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতার ভারতানুরাগে জগদীশচন্দ্রের পরম আনন্দ। পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠল একটি অতি-মধুর সম্পর্ক। জগদীশচন্দ্রের আবাসে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলরতন সরকার, রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত ইত্যাদি দিকপালদের। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় নিবেদিতার অবিচল আস্থা। প্রেসিডেন্সী কলেজে কালা চামড়ার অপরাধে কম-বেতন-পাওয়া অস্থায়ের প্রতিবাদে তাঁর বেতন-না নেওয়া সংগ্রামে নিবেদিতার সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি প্রেরণা দিয়ে সঞ্জীবিত করেছে তাঁকে। বিজ্ঞানীর সমস্ত আবিষ্কারের পাণ্ডুলিপি সযত্নে স্বহস্তে প্রস্তুত করতেন তিনি। আচার্য বসুর 'উদ্ভিদের সাড়া' বইয়ে তার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে সেকথা জানাতে গিয়ে আচার্য লিখেছেন "শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় লইতাম।" জড়ের জীবনে চৈতন্যকে আবিষ্কার করাই ছিল জগদীশচন্দ্রের সাধনা। বিদেশীর অনাদর ও দেশবাসীর অজ্ঞানতা-প্রসূত বিরোধিতা মন ভেঙে দিত তাঁর। সংবাদ-পত্রে প্রচারের ব্যবস্থা করে, জনসভায় অভিনন্দিত করে বিজ্ঞানীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন নিবেদিতা এবং সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই সাধনাকে পৌঁছে দেন সিদ্ধিতে। নিবেদিতার মৃত্যুর পর বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন বক্তৃতায় সেই মহিয়সী মহিলার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র "আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহিয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি। এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে কত উৎসাহ ছিল তাহা একমাত্র আমিই জানি।" বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষে খোদিত নিবেদিতার পরম প্রিয় বজ্রচিহ্ন এবং দ্বারদেশে পূজারিনী মূর্তি তাঁর স্মৃতি পূজায় বিজ্ঞানীর নীরব প্রণতি।

নিবেদিতা বিবেকানন্দের রাজনৈতিক জীবন। স্বামীজির মানব-প্রেম ও দেশমুক্তির আদর্শের তিনিই উত্তর-সাধিকা। নিবেদিতা বলতেন—"আমার ব্রত এই জাতিকে জাগ্রত করা।" গুরুদেবের তিরোধানের পর তিনি ঝাঁপ দিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে। তাঁরই প্রেরণায় গড়ে উঠল বিপ্লবী দল, প্রকাশিত হল যুগান্তর পত্রিকা। ভারতের যুব সমাজ জেগে উঠল তাঁর বক্তৃতার আগুনে। ১৭ বোসপাড়া লেন হল সারা ভারতের বিপ্লবীদের মহাতীর্থ। বরোদার অধ্যাপক অরবিন্দকে তিনি আহ্বান জানালেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে। জানালেন তিনি অরবিন্দের পাশেই থাকবেন—"বিপ্লব জন্ম নিতে চলেছে। বাংলা দেশে এর সূচনা দেখে এসেছি। এখন দরকার নেতার। গুরুজীর নামে শপথ করছি আমি আপনার পাশেই দাঁড়াব। আপনি যা চান আমিও তাই চাই। গৈরিকবাস আমার ছদ্মবেশ।" রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ পুলিশের উপদ্রবে এবং বিপ্লবী মতবাদের জন্যে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলেন নিবেদিতার সংগে! নিবেদিতাকে তাঁরা ক্ষমা করেননি কোনদিন। হোলি মাদারের সেন্টিনারীতে তুমুল হৈচৈ হলেও নিবেদিতার একখানা ভাল ছবি বাজারে বিক্রী করার গরজ বোধ করেন না তাঁরা।

দাবানলের মত বিপ্লবের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়। আন্দোলন এগিয়ে যাবার পথ নিল পিঃ মিত্র, অরবিন্দ, নিবেদিতা ইত্যাদির নেতৃত্বে। কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশন-বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড কার্জন ভারতবাসীকে বললেন "মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞপরায়ণ।" অপমান ও ঘৃণায় লাল হয়ে উঠল দেশের মুখ। নিবেদিতার প্ররোচনায় তাঁর গুরুদাসের লেখা প্রতিবাদ ছাপা হল অমৃতবাজার পত্রিকায়। ঐ একই দিনে নিজে একটি প্রবন্ধ লিখে নিবেদিতা প্রমাণ করে দিলেন যে কোরিয়ায় চাকুরীর অজুহাতে বয়স ভাঁড়িয়ে ৩৩ থেকে ৪০ বছর করেছিলেন স্বয়ং বড়লাট। Problems of the East বইয়ের ১৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখলেন, "Problems of the East বইয়ের এই উদ্ধৃতিটি এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ থেকে বেমালুম বাদ দেওয়া হয়েছে—লেখক অবশ্য 'সেই একই আছেন, জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন অর্থাৎ লর্ড কার্জন। এখন পাঠক বিচার করুন প্রকৃত মিথ্যাবাদী কে এবং কে অতিরঞ্জন প্রিয়।" বড়লাট কার্জনের দু গালে চুণ মেখে দিলেন নিবেদিতা, কোন কথা বলার সাধ্য হলনা বড়লাটের। ভারতীয় সংবাদিকতাকে তিনি দেখালেন কিভাবে অন্যায় ও মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিতে হয়, কিভাবে রক্ষা করতে হয় জাতির আত্ম-সম্মান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও নবজাগরণের কথা তিনি প্রকাশ করলেন নিউ ইণ্ডিয়া, প্রবাসী, স্টেটসম্যান, ডন, নিউ ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। দেশের তারুণ্যকে তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর গুরুদেবের বজ্র-বাণীতে—"তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য-দেবতা তোমার জননী জন্মভূমি।" স্বদেশী শিল্প-প্রচেষ্টার নেপথ্যে তাই তাঁর সক্রিয় সমর্থন। একদল ছেলেকে তিনি বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন জার্মানী, আমেরিকার

মত বিপ্লবোন্নত দেশ থেকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় পারদর্শী হবার জন্যে। বাংলার অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির মূলে আছে তাঁরই প্রেরণা ও আর্থিক সাহায্য। বড়লাট কার্জন কিন্তু ভোলেননি দুর্বিনীত বাংলাকে। বাঙালীকে ধ্বংস করবার জন্যে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ড করার আদেশ জারী করলেন তিনি। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নবজাগ্রত বাংলা প্রতিজ্ঞা নিল সেই Settled factকে unsettled করার। দার্জিলিং থেকে ছুটে এসে বংগভংগ-বিরোধী আন্দোলনের সামিল হলেন নিবেদিতা। দুর্যোগের কালোমেঘের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন দেশের সংকল্প-বাণী—"যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ইংরেজকে এই বঙ্গ-ভঙ্গ আইন উঠাইয়া লইতে বাধ্য না করে ততদিন আমরা সংগ্রাম করিয়া যাইব।"

১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় যুগান্তর। প্রথম সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিপ্লবের কেন্দ্র ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। বরিশালে ফুলার দমননীতি খুলে দিল বিপ্লবের রক্তরাঙা পথ। ফুলার-বধের আদেশ দিলেন অরবিন্দ ও নিবেদিতা। শিবাজী-উৎসবে সেতু-বন্ধন হল বাংলা ও মহারাষ্ট্রের। নিবেদিতার ললাট-নেত্রে জ্বলে উঠল প্রলয়ের বহ্নিশিখা। শ্রীঅরবিন্দ নিজমুখে বলেছেন—"বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টায় আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা মহিয়সী নিবেদিতা!" জনৈক জাতীয়তাবাদী নেতা নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে বোমা-পিস্তলের সত্যিই কোন দরকার আছে কিনা। নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন—"নিশ্চয়ই আছে। বোমা না ফাটালে ইংরাজ এককণাও ছাড়বে না। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।" এইতো নিবেদিতার সত্যিকার স্বরূপ।

ব্রিটিশ শাসকদের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন নিবেদিতা। গোয়েন্দা লাগল তাঁর পিছনে। ফাঁসির দড়ি থেকে তাঁকে বাঁচাল তাঁর চামড়ার রঙ্। মারতে না পেরে তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার ষড়যন্ত্র করল শাসক-গোষ্ঠি। আত্মরক্ষার্থে তাঁকে যেতে হল লণ্ডনে। ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার আগে বিপ্লবীদের ডাক দিয়ে বললেন—"তোমাদের একহাতে অরবিন্দ তুলে দিয়েছেন গীতা আর অন্য হাতে আমি দিয়েছি বোমা। আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্রদাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছ। ওরা গুরুকী ফতে।" এই হল বিপ্লবী নায়িকা নিবেদিতার স্বরূপ, জ্যোতির্ময় রূপ।

ভারতের সংকটের ডাকে আবার তাঁকে ফিরতে হল ছদ্মবেশে। দমননীতির হিমরোলায়ে বিপ্লবীরা স্তব্ধ। অরবিন্দ রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তাঁকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চন্দননগর পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন নিবেদিতা। এবার তিনি একা। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে স্বদেশী-আন্দোলনের ছবি। শত শত শহীদের রক্তদানে যে বাংলার মাটি উর্বর হল একদিন তাতে সোনার ফসল ফলবেই। বাঙালীর নবজীবনের উদ্বোধন সার্থক হবে স্বাধীনতার আশীর্বাদে এই বিশ্বাসে রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন তিনি।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন তাঁর বিদায়-বাণী—"আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড ও অবিনশ্বর। এক আবাস, এক আকৃতি আর এক সম্প্রীতি হইতেই জাতীয় ঐক্যের উদ্ভব হয়। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাহার খেলা, বিজ্ঞানের বিদ্যা ও ঋষির ধ্যানে যাহার প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি, সেই শক্তিই আজ আমাদের বক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহার নাম আজ জাতীয়তা। আমি বিশ্বাস করি বর্তমান ভারতের মূল রহিয়াছে প্রাচীন ভারতের গভীরে, সম্মুখে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভাবীকাল। হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে মূর্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও। আমাকে তোমার করিয়া লও।—নিবেদিতা"। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের আদর্শের সংগে নিবেদিতার আদর্শের মিলনে এ যেন নবভারতের ভাবনালোকের বিচিত্র ত্রিবেণী সংগম।

বিবেকানন্দের বিশেষ বাসনা ছিল ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার। নিবেদিতা গ্রহণ করেন সেই দায়িত্ব। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমস্ত গৌরব তাঁরই। কারও করুণার প্রত্যাশী না হয়ে, অনাহারে অর্ধাহারে লেখনী-চালনা করে বিদ্যালয়ের খরচ জোগাড় করেছেন তিনি। ছাত্রীদের চরিত্রগঠন ও দেশভক্তির উজ্জীবনই ছিল তাঁর নিরলস প্রয়াস। শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর উক্তি বর্তমানকালেও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"শিক্ষা! হায়, ইহাই তো ভারতের প্রধান সমস্যা। কেমন করিয়া প্রকৃত শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেমন করিয়া ভারতের সন্তান হিসাবে তোমাদের গড়িয়া উঠিতে হইবে, য়ুরোপের অক্ষম অনুকরণে নয়, ইহাই তো সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হইবে হৃদয়ের বিস্তার সাধন আর আত্মচেতনার উন্মেষ সাধন এবং মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন। জগৎ আর জীবনের মধ্যে একটা জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করাই হইবে তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য।" দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে এ যেন অরণ্যে রোদন।

নিবেদিতার সাহিত্য-সৃষ্টিও অপূর্ব। ভারত-আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও সেই সত্য ও সুন্দরকে দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করাই তাঁর সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ভারতের প্রতি তাঁর অতুলনীয় ভালবাসারই অনুরণন। The Master as I saw Him, The Web of Indian Life, Cradle Tales of Hinduism, the Footfalls of Indian History ইত্যাদি বই বার বার পড়বার মত।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে একটি জাতির নবজাগরণ যখন সূচিত হয় তখন সেই জাগরণের প্রেরণা সঞ্চারিত ও পল্লবিত হয় সমাজজীবনের প্রতি অণুপরমাণুতে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতে নবজীবনের জোয়ার আসে হতাশার মরা গাঙে। ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও প্রভাব সেই যুগান্তরের মূলে।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আর তিনি বিক্রমাদিত্য এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ সময়ে ও তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীর কবি কালিদাস ভারতবর্ষের কাব্য-জগৎ আলো করেছিলেন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দের প্রথম অর্দ্ধাংশ—এই স্বল্প কালটুকুই মহাকবি কালিদারে জন্ম-মৃত্যুর'রেখাঙ্কিত।

কৌতূহল জাগে মনে—উজ্জয়িনীর কবি আমাদের এই ভারতবর্ষের কতোখানি বা কতোটুকু জানতেন! বিরাট, বিশাল এই ভারতবর্ষ তখন ছোটোবড়ো অগুন্তি রাজ্যের দ্বারা খণ্ডিত ও বিভক্ত। রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো লেগেই ছিলো, তাছাড়া দেশভ্রমণ সেকালে সহজ ছিলো বলে তো মনে হয় না। পথ তখন হাতছানি দিয়ে ইসারা করতো না পথিককে দিগন্তের পানে। অবিশ্যি পথ না চলেও অতীতের মঞ্জুষা থেকে বহু দুঃসাহসিক পথিকদের, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের ও ভিক্ষুদের অভিজ্ঞতা নিজের করে নেবার সুযোগ তখন ঘটে গেছে। পৌরাণিক যুগ ও বৌদ্ধযুগ এই দুই বিরাট যুগের, বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের জ্ঞান ও মুক্তির স্রোত তখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত তো হয়েছেই, ভারতের সীমা অতিক্রম করে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বন্ধ্যা মানসভূমিকে সরস করে আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রায় ন'শ বছর পরে কালিদাসের জন্ম। তাই পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে ভারতের ভৌগলিক রূপের ধারণা করা কালিদাসের পক্ষে আদপেই দুঃসাধ্য ছিলো না।

কালিদাসের কাব্য ও নাটক পাঠ করে সে কালের ভারতবর্ষের যে ছবি আমরা পাই সেটি হচ্ছে এই: দেবতাত্মা পর্বতরাজ হিমালয় রয়েছেন উত্তরে। কালিদাসের কাব্যে এই পর্বতকে কোথাও হিমালয়, কোথাও বা হিমাদ্রি বলা হয়েছে। মানস সরোবরের খবর মহাকবি জানেন। মানস-সরোবর থেকে আশুমাণিক পঁচিশ মাইল দূরে যে কৈলাস পর্বত রয়েছে তাও কবির অজানা নয়। হেমকূট ও কুবেরশৈল কৈলাসেরই অন্য দুটি নাম। মন্দার পর্বত কৈলাসেরি কাছাকাছি তারও উল্লেখ পাই কালিদাসের কাব্যে। সুমেরু পর্বতের উল্লেখ আছে কালিদাসের রচনায়। একালের কেদারনাথ পর্বতই হচ্ছে সেকালের মেরু অথবা সুমেরু। বিন্ধ্য-পর্বত, রেবামদীর উৎপত্তিস্থল অমরকূট পর্বত, একালের অমরকণ্টক, চিত্রকূট পর্বত, বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের কাস্তনাথগিরি, রামগিরি (বর্তমান রামটক পাহাড়, নাগপুর থেকে চব্বিশ মাইল উত্তরে) ও মহেন্দ্র পর্বত (উড়িষ্যা থেকে মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী)—এই সব পর্বতেরা স্থান পেয়েছে মহাকবির কাব্যে। নদীরাও কাব্যে উপেক্ষিতা নয়। মালিনী, (বর্তমান নাম চুকা।

সাহারাণপুর ও অযোধ্যা জেলা দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত) তমসা (সরযূর শাখা, বর্ত্তমান নাম তন্‌স), কপিশা (মেদিনীপুর কাসাই নদী), রেবা (বর্ত্তমান কালের নর্মদা) ও বরদা (মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা নদী)—এই নদীগুলি বাস্তবলোক থেকে রূপের অমৃতলোকে চিরন্তনী হয়েছে মহাকবির কৃপায়।

পশ্চিমে সিন্ধু নদী ঘেঁষে চলেছে আরব্য সাগরের দিকে। পূর্বে চলেছে গঙ্গা পূর্বসাগরের (বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগর) পানে। মাঝপথে যে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে তাও কবির অজানা নয়। তাল ইক্ষু ও ধান অপর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলা দেশে হয়, জাফরান ও আঙ্গুর হয় পাঞ্জাবে, মাদ্রাজ অঞ্চলে সুপুরি ও নারকেল গাছ সমুদ্রের তীর ছেয়ে জন্মায়, রেবানদীর তীর পুন্নগে ও কেতকীতে ছয়লাপ—এসব বর্ণনা রয়েছে কালিদাসের কাব্যে।§

শিপ্রার তীরে উজ্জয়িনী নগরী, সেখানে মহাকালের মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় পূজা হয়। বেত্রবতী নদীর তীরে বিদিশানগরী (বর্ত্তমানকালের ভিল্‌সা)। ভোপাল থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর পশ্চিমে) কেয়া ফুল, জম্বু বৃক্ষ ও মানস-যাত্রী মরাল—এই এয়ী শোভার আকর। মেঘদূত-এ মেঘের আকাশ-পাড়ি দেবার ছবি কবি এঁকেছেন—বিদিশার নিকটেই নীচে পাহাড় কদম ফুলে আলো হয়ে আছে। তার কিছু দূরে নির্বিন্ধ্যা (বর্ত্তমানের নেওয়াজনদী) নদী যা পার হয়ে উজ্জয়িনীতে যাবার জন্যে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করেছেন। উজ্জয়িনীতে কিছুকাল বিশ্রাম করে পথ-শ্রান্তি দূর করে চর্মন্বতী নদী (বর্ত্তমানের চম্বলনদী) পার হয়ে দশপুর হয়ে মেঘ যাবে 'ব্রহ্মবর্ত্ত'-এ। ব্রহ্মবর্ত্ত হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব। 'ব্রহ্মবর্ত্ত' থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে কনখল্ পর্বতের দিকে মেঘকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন যক্ষ। সেখান থেকে মানস-সরোবর হয়ে মেঘ যাবে কৈলাস—সেখানে অলকা।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্বপশ্চিম সব অংশের খবরই কালিদাস মোটামুটি জানতেন, যদিও তাঁর কাব্যে হিমালয় ও মালব্যের বর্ণনাই সব চেয়ে বেশী করে আছে। কবির প্রিয় উজ্জয়িনী এই মালব্য প্রদেশে। তাই মালব্য প্রদেশের ফুল, গাছ, নদী, পাহাড় ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'ঋতু সংহার' কাব্যে কালিদাস যে ছয় ঋতুর বর্ণনা করেছেন সে ঋতুগুলি মালব্য প্রদেশেই আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোনখানে নেই। তা ছাড়া যে সব গাছ, ফুল, ফল ও জন্তুদের বর্ণনা করেছেন কালিদাস 'ঋতু-সংহার'-এ সেগুলি শুধু মালব্য প্রদেশেই দেখা যায়। তাই স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কালিদাস ছিলেন মধ্যভারতের মালব প্রদেশবাসী।

যে সব গাছের কথা কালিদাসের রচনায় পাই, যেমন দেবদারু, সরল, ভূর্জ, চৈত্য, উদুম্বর, নমেরু, সর্জ, আম্র, জম্বুক, মধুক, সপ্তভেদ, করঞ্জ, অর্জুন, মল্লিকা, সিন্ধুবার, বন্ধুক, কর্ণিকার,

§ হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের বাসভূমি, দেবদারু, ভূজ সরল ও নমেরু গাছের ঘন অরণ্য, সেখানে মৃগেরা বনের বাতাসকে মন্থর করে কস্তুরী গন্ধে, আসামের অরণ্যে বিশালকায় হাতীদের বাস—এ সব কালিদাস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

কোবিদার, কল্পদ্রুম, পারিজাত, মন্দার, কুসুম্ভ, কন্দলী, চন্দন, জবা, স্থলকমলিনী, নিচুল, বেতস, ভদ্রমুস্ত, পুগ ও তমাল ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের গাছ।

এদের মধ্যে দেবদারু ও সরল হচ্ছে হিমালয়ের দুজাতের পাইন গাছ। নমেরু গাছটিকেও কালিদাস হিমালয়ের বাসিন্দে করেছেন। সর্জ হচ্ছে শাল গাছ। অযোধ্যা থেকে হিমালয়ে বশিষ্ঠ আশ্রমে যাবার পথে দুধারে শালগাছের বন। মধুক হচ্ছে এ কালের মহুয়া। নর্মদার তীরে বহু দূর পর্যন্ত অসংখ্য করঞ্জগাছ। খান্দেশের গাছ হোলো সল্লকী। পারিজাত, কল্পদ্রুম ও মন্দার, এই তিনটি হচ্ছে কবির কল্পনার গাছ—স্বর্গের গাছ। নিচুল, বেতস ও বাণীর এগুলি নানা জাতের বেত গাছ, রাজগিরি পর্ব্বতের আশে পাশে এদের জন্ম। ভদ্রমুস্ত হচ্ছে কাশ। পুন্ড্র, তমাল ও চন্দন এগুলি হচ্ছে মলয়স্থলীর গাছ। মাল্যের গাছ জম্বু হচ্ছে আমাদের জাম গাছ, নর্মদা নদী এই জম্বু গাছের ঘনসারির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। উদুম্বর হচ্ছে এক ধরণের ডুমুর গাছ। উজ্জয়িনী ও চর্মন্বতী নদীর মাঝখানে যে দেবগিরি পাহাড়, সেই পাহাড় ছেয়ে আছে এই গাছে। আম্রকূট পাহাড়ে আম গাছের কুঞ্জ; আমের মোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল।

ভারতবর্ষের গাছ, নদী, পাহাড় এমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে কবির কল্পনার কাছে, নিজেদের স্থান করে নিয়েছে তাঁর কাব্যে। এবারে আমরা চলবো ফুলের সন্ধানে। যে অসংখ্য ফুল ফুটেছিল পথের ধারে, কাননে, নদীর তীরে, পর্বতের সানুদেশে, অরণ্যে সেই অতীতের ভারতবর্ষে, তাদের সকলের খোঁজে আমরা যাচ্ছি না। কি লাভ তাদের থেকে যদি তারা কবির হৃদয় জয় করতে না পারলো! তারা সেদিন থেকেও, ছিলো না, কেন না তারা মহাকবির মনহরণ করতে পারে নি। যে ফুলগুলি কবির কল্পনায় রক্তে রঙীন হয়ে, তাঁর ভাবরসের শিশিরে সিক্ত হয়ে অপরূপ রূপ দিয়েছে তাঁর কাব্যে, সেই গরবী ফুলগুলির খবর নেবার জন্যে আমাদের মন উৎসুক। তাদেরই সন্ধান এবার নেওয়া যাক। মহাকবি কালিদাস পঁয়ত্রিশটির বেশী ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দেন নি। আশ্চর্য লাগে মনে করতে যে পথের দুধারের ফুলের ঝরণা-ধারা, মেঠো ফুলের দল, অগুন্তি নাম না জানা সব ফুল কবির মনে স্থান পায় নি। তিনি যেমন বাঁধাধরা কয়েকটি ফুলের চৌহদ্দীর মধ্যে তাঁর কল্পনাকে ও ভাবকে বিচরণ করতে দিয়েছেন। রাজ-সভার কবি তিনি, যেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন মেঠো ফুলকে, অখ্যাত ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দিতে। রাজ-সভা কবির পক্ষে এমনিই কাব্য-ঘাতিনী! আর এক মহাকবির কথা মনে পড়ে যায়। দেশবিদেশের কোনো ফুল বাদ পড়ে নি, রবীন্দ্রনাথের মনে ও কাব্যে তারা সবাই স্থান পেয়েছে। শুধু পদ্ম নয়, বকুল নয়, কেতকী নয়, আকন্দ ফুল, ঘাসের ফুল, কতোশতো অনাদৃত উপেক্ষিত ফুল অমর হয়ে রইলো তাঁর কাব্যে। অতীতের কাব্য-নির্দিষ্ট ফুলগুলি তাঁর সৌন্দর্য-বোধকে বন্দী করে রাখতে পারে নি। তাদের রূপের সীমানার মধ্যে। শাস্ত্রের কিম্বা রাজ-দরবারের নির্দ্দেশ মেনে ফুলের জাত-বিচার রবীন্দ্রনাথ করেন নি। অ-শাস্ত্রীয় ফুলের দল তাঁর কাব্যে রসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কালিদাস এখানে হার মেনেছেন তাঁর সমগোত্রীয় এই মহাকবির কাছে। রাজ-সভা যেমন কাব্য-ঘাতিনী, শাস্ত্রবিধিও তেমনি কবির কল্পনা-নাশিনী।

কালিদাসের আদরের ফুলগুলির দিকে এখন নজর দেওয়া যাক। দেখা যাচ্ছে পদ্ম, কুমুদ, অশোক, শিরীষ আর চূতমঞ্জরী—এই কটি ফুলের উপর কালিদাসের অনুরাগ ছিলো সব চেয়ে বেশী। এই ফুলগুলিই তাঁর নানা কাব্যে দেখা দিয়েছে বারে বারে। তারপরে বকুল, কাশ, পলাশ, নবমল্লিকা, কুন্দ, কেতকী ও কর্ণিকার-এর সমাদর। শেফালিকা অনাদৃতা ও উপেক্ষিতা। মহাকবি মাত্র একবার তাকে স্মরণ করেছেন। শেফালীর কথায় মনে পড়ে যায় আর এক মহাকবির কথা। তিনি শুধু শিউলির বহিরূপটুকুই ধরে দেন নি, শেফালি বনের মনের কামনা-র রস তিনি আমাদের পান করিয়েছেন, আমাদের হৃদয়ের ছুটি আঁখি ভরে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ শিউলির কামনার রূপ। এই অন্তর্লীনতার কাছ দিয়েও কালিদাস আসতে পারেন নি। রূপের বার-মহলে ঘোরা ফেরা করে তিনি নিজে ক্লান্ত, আমাদের ক্লান্ত করে ছেড়েছেন।

এবারে একটি একটি করে ফুল ধরে তার গন্ধ অনুসরণ করে কালিদাসের কাব্য-লোকে প্রবেশ করা যাক।

এক—যূথিকা

যূথিকা কবির মনকে তেমন বেশী নাড়া দিতে পারে নি। মহাকবির কাব্যে যূথিকার দেখা পাই মাত্র তিনবার—'মেঘদূতম্'এর চতুর্থ অঙ্কে পূর্বমেঘে, ঋতু সংহারম্-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় আর 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে।

'ঋতু সংহারম্'-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষাবর্ণনায় এই বর্ণনা আছে—

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাম্
বিকসিতনবযূথৈর্যূথিকাকুন্দলৈশ্চ
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাম্
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥

যূথিকার কুঁড়ি—মালতী কুসুম নব ফুলদলে গাঁথা
বকুলের মালা, প্রিয়জনসম সোহাগেতে ভরি মন,
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষাঋতু,
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নব কদম্ব-আভরণ।

'মেঘদূতম্'-এর পূর্বমেঘের কবিতাটি হচ্ছে

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চন্
উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৬ ॥

ঘুচিলে ক্লান্তি, নদীতীরজাত যূথীর কলিকাগুলি
সিঞ্চিত করি নববারিধারে করো সৌরভময়,

কপোলের স্বেদ মুছিতে যাদের কানের-কমল ম্লান
ছায়াদানে লভ চয়ন-ক্লান্তা নারীদের পরিচয় ॥

'বিক্রমোর্বশীয়ম্'-এর চতুর্থ অঙ্কে পাই—"মদকল! যুবতি শশিকলা গজযূথম! যূথিকাশবলকেশী! স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে সুখালোকা।"

হে মদমত্ত গজরাজ, যূঁই ফুল কেশে দিয়ে যে নারী বিচিত্ররূপে সেজেছে সেই স্থিরযৌবনা প্রিয়া তোমার কি দূরদেশে অবস্থান করিতেছে?

দুই—জপা

উজ্জয়িনীর রাজদরবারে জপার আদর বিশেষ ছিলো বলে মনে হয় না। কালিদাস শুধু একটিবার জপা-কে স্মরণ করেছেন মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘে। শঙ্করের নৃত্য-বর্ণনায় কুরবক্, শিরীষে কেশর—এরা যে সব বেমানান্ ও অশোভন মনে হবে, তাই শঙ্করের নৃত্যের ছবিকে সম্পূর্ণ করতে জপার ডাক পড়েছে। মেঘদূতের কবিতাটি হচ্ছে—

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজপাপুষ্পরক্তং দধানঃ
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টি ভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৮ ॥

দুইভুজ তরু ঊর্দ্ধ উঠায়ে তাণ্ডব নাচে মাতিবেন শিব যবে,
করিও ব্যাপ্ত ভুজ তরুবন জপাফুল সম রাঙা রক্তে সন্ধ্যার,
ঘুচিবে ইচ্ছা শিবের তখন নৃত্যের কালে নাগাজিন পরিবার,
স্নেহভরে উমা স্তিমিত নয়না হেরিবে তোমারে তবে ॥

তিন—সিন্ধুবার

উমার দেহ সাজাতে অশোক কর্ণিকার ফুলের সঙ্গে সিন্ধুবার ফুলের তলব পড়েছে—যদিও বারেকের তরে। ফুলটিকে একালের কোনো ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছি নে। ফুলটি অজানা রয়ে গেলো, যদিও মুক্তর সঙ্গে তুলনা থেকে তার শুভ্র বরণ অতীতের অন্ধকার ভেদ করে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে উমার এই বর্ণনা আছে—

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩ ॥

অশোকফুলে পদ্মরাগ মাণিক হোলো লাঞ্ছিত কর্ণিকার নিলো সোনার স্থান,
সিন্ধুবার বাজিল যেথা মুকুতা হতো বাঞ্ছিত, ফাগুনের ফুল দিল দেহে অবদান ॥

চার—মধুক

একালে মধুকের আদর নেই শিক্ষিত সমাজে। থাকবেই বা কি করে? মালার আদর তো কমে গেছে একালের বরবর্ণিনীদের কাছে। অতো সময় কোথায় এ যুগের মালবিকা চতুরিকাদের যে তারা ধীরে সুস্থে প্রসাধন করবেন, লোধ্রফুলের রেণু মাখবেন মুখে, নয়নে কাজল দেবেন, হাতে লীলাকমল নেবেন, গলায় মধুকের মালা পরবেন? এখন এই যন্ত্রযুগের চলার ছন্দের সঙ্গে তাল মান রেখে তাঁদের প্রসাধনকে তাঁরা যুগোপযুগী করে নিয়েছেন। ছোট্ট কৌট থেকে হরেক রকমের রঙ বের হয় কলের ধোঁয়ায় ধূসর তাঁদের বিবর্ণ কপোল রঙীন করবার জন্যে। অধরের জন্যে shell-আকৃতি টিনের চোঙা থেকে বের হয় কটকটে লাল রঙ। মুহূর্তে প্রসাধন সারা হয়, নেপথ্যবিধান আর নেই, সবার সামনেই প্রসাধন। হায়রে! এতোটুকু মোহ উপভোগ করবার সুযোগ পুরুষদের দিতে এরা নারাজ। এরা আবার এমনি ঘোর বাস্তবপন্থী। জীবন্ত সব মোহমুদ্গর এরা। হাতে এদের লীলাকমলের স্থান নিয়েছে বৃহদাকার ব্যাগগুলি—চোঙা, কৌটও এযুগের লোধ্ররেণু পাওডারের আশ্রয়স্থল। মধুক কিন্তু আজও বেঁচে আছে সাওতাল পল্লীবাসীদের মধ্যে। মহুয়ার কদর তারা জানে। পান করে তারা মহুয়া ফলের রস, মাথায়ও গোঁজে মহুয়ার হলদে ফুল সাওতাল রমণীরা।

মধুকের বর্ণনা আমরা পাই 'কুমার-সম্ভবম্'-এর সপ্তম সর্গে আর 'রঘুবংশম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে। সেকালের নারীদের চুল শুকোনোর লীলা বর্ণনা করে কালিদাস 'কুমার-সম্ভবম্'-এ লিখেছেন :—

"ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না॥ ১৪॥

ধূপের ধোঁওয়ায় শুষ্ক করিয়া কেশ, কুসুম সাজায়ে ঘন চিকুরের মাঝ,
শ্যামলদূর্বা পাণ্ডু মধুক ফুলে মালা গাঁথি নারী বাঁধিল অলক আজ।

'রঘুবংশম্'-এর ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর বর্ণনা করে কবি বলেছেন—

"এষ তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্‌বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদি দেশৈনমভাষমাণা॥ ২৫॥

বাক্য অন্তে হেরি তারে যবে নির্বাক হয়ে করিলো নীরস প্রণতি।
এলোমেলো হোলো দূর্বা-শোভিত মধুকমালিকাখানি, চলিলা ইন্দুমতী॥

(ক্রমশঃ)

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

মৃগনয়নী হঠাৎ উঠে। কি ভেবে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বৃষ্টিতে ভিজে চলে যায় নিচের ঘরে। ঘরে গিয়ে দোর ভিজিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘরে কেমন ওর ভয় ভয় করে। ঘরের ভেতর চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। বাইরের বর্ষার মতই সরলার চোখে বর্ষা নেমেছে। সরলার কথাটা সইতে একটু সময় নেয় মৃগনয়নী। নিজেকে ধীরে শান্ত করার চেষ্টা করে। সময় কাটে।

বৃষ্টি ধরে আসছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে তখনও। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মৃগনয়নী আবার ঘর থেকে না বেরিয়ে পারে না। ধীর পায়ে খুব আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সরলার ঘরের সামনে যায়। ঘর বন্ধ। বাইরে থেকে শিকল তোলা। সরলা ঘরে নেই। কোথায় গেল। বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে ওঠে। সরলার চোখের জলে ভেজা মুখখানি মনের ওপর ভেসে ওঠে ওর। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিতে মায়ের ঘরের কাছে যায় মৃগনয়নী। বৃদ্ধা চুপ করে বসে আছে। প্রদীপের আলোয় দেখাও যায় সরলা নেই। রান্নাঘরের কাছে আসে। ল্যাম্পো জ্বলছে রান্নাঘরে। উনুনের কাঠ যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে সরলা। পিছনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ায় মৃগনয়নী।

বারে বারে চোখ মুছচে সরলা।

—মেজদি।

মৃগনয়নীর ডাকে সরলা মুখ ফেরায়। চোখদুটো ওর টুকটুকে রাঙা। কালো গালদুটো তখনও ভিজে।

তুমিই মানুষ করো মেজদি। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তুমি ছাড়া কে মানুষ করবে বলো?

মৃগনয়নী সরলার পাশে গিয়ে বসে।

সরলা কথা বলতে পারে না। নাকের পাতা দুটো ফুলে উঠছে, ঠোঁট কাঁপছে।

মৃগনয়নী ওর হাত ধরে,—চলো চালতে মাথা খানিকটা রয়েছে, ওটা শেষ করে দুজন রান্নাঘরে আসব।

সরলা ওর সঙ্গে সঙ্গে ওঠে। কিন্তু একটা কথাও বলে না।

সন্ধ্যাটা নীরবে নিঃশব্দে কেটে যায়। রাত্রে আজও বনবিহারীকে ঠেলতে হয় মৃগনয়নীর—কই, শুনছ?

চোখদুটো বুজেই বলে বনবিহারী,—বলো, শুনছি।

—বলেছিলে?

—কি?

—বাঃ! ভুলে গেলে এর ভেতরেই?

—উঁ?

—এমনি শুয়ে বসেই কি চলবে?

—হুঁ।

মৃগনয়নী আবার বিরক্ত হয়, ঠেলা দেয়,—উ আর হু, কথার উত্তরটাও দেবে না! বনবিহারী এতক্ষণে চোখ কচলে উঠে বসে,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে!

—আমার যে ঘুম যাবার দশা!

—কেন? কেউ কিছু বলেছে?

—বলবে আবার কি?

—তবে?

—কতদিন ধরে তো বলবো বলবো কোচ্ছ, বলেছ?

—অ! সেই কথা! মনে পড়ে বনবিহারীর,—না, ঠিক জুত মত সময় পাচ্ছি না। মানে একটু ইয়ে করে বলতে হবে তো!

—আর ইয়ে করেছ!—হতাশ হয় মৃগনয়নী।

একটু থেমে বলে,—তোমাকে তো কত করে বললাম। কলকাতায় যাবার খরচা আমি দোব। আমার গয়নাগুলো বেচে টাকা নিয়ে কলকাতায় যাও। কিছু টাকা হাতেও থাকবে। চাকরীর চেষ্টা করতে পারবে।

বনবিহারী কানের পাশটা চুলকে নেয়।—মেজদা তোমার গয়নার টাকা নিতে যদি রাজী না হয়!

—গয়নার টাকা বলবার তো দরকার নেই। তুমি বলবে, আমার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ। আমার বাপের বাড়ী তো বড়লোক, ধরে নেবে তারাই না হয় টাকা দিয়েছে!

—ধরলাম না হয়।

আবার বিরক্ত হয় মৃগনয়নী,—তোমাকে ধরতে বলেছে কে? তুমি তোমার মেজদাকে বলো।

—বেশ মেজদাকে তাই বলব।

—বলবে তো আজ বিশদিন ধরে বলছ।

—কালই বলব।

মৃগনয়নী একটু আশ্চর্য হয়। বনবিহারীর ফরসা পিঠের ওপর লাল তিলটার কাছে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—গয়না কি হবে। তোমরা যদি চাকরী পাও। টাকা রোজগার করো। গয়না আবার গড়িয়ে দেবে!

বনবিহারী চুপ করে থাকে।

—আর একটা কথা ছিল কি।

—কি?

—ওরা তো একখানা চিঠিও দিল না।

—ওরা কারা?

—বাবা, কর্ত্তাবাবু ওরা।

তাই তো দেখছি। ভাবছি তোমার গয়না নিলে তাঁরা আবার রাগ করবেন নাতো?

—সে আমি যা হয় বলে ঠিক করে নোব। তুমি একটা কাজ করবে?

কি?

একখানা খাম এনে দেবে? কর্ত্তামাকে একখানা চিঠি লিখব। অনেকদিন রইলাম ওখানে একবার যেতে ইচ্ছে হয়।

বলতে বলতে গলাটা একটু ভারী হয় মৃগনয়নীর।

বনবিহারী কথা বলে না।

—এখান থেকে যেতে দেয়নি বলে ওরাও বোধহয় রাগ করেছে?

বনবিহারী একটা নিঃশ্বাস ফেলে,—করতে পারে।

ভাবছিলুম কি, আমি না হয় একখানা চিঠি লিখি লুকিয়ে।

—এতে তোমাদের মান খোয়া যাবে না। আমি কর্ত্তামাকে লিখব নেবার জন্যে লোক পাঠাতে।

—তোমার ছেলে হবার কথাও কি লিখবে?

মৃগনয়নী লজ্জায় একটু সঙ্কুচিত হয়,—ধ্যেৎ তা কখনও লেখা যায়!

—বনবিহারী হাসে,—একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না হয় লিখো। তাছাড়া তুমি কি লিখতে জানো?

—দ্বিতীয়ভাগ অব্দি পড়েছি তো! একটু একটু পারি। না হয় আমার জবানীতে তুমি লিখে দেবে?

—তা হয় না। ওরা বুঝতে পারবে।

—তবে না হয় আমিই লিখব।

—বেশ, খাম একখানা এনে দোব। আমার কাছে আবার এখন পয়সা নেই।

—আমার কাছে আছে। বিয়ের আশীর্ব্বাদীর টাকার একটা এখনও আছে। কয়েকটা টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

বনবিহারী খুসী হয়,—বেশ হবে। বেশ হবে। টাকটা দিও। আমার বিড়ির দোকানেও ধার হয়েছে এগারো পয়সা। শোধ করে দেওয়া যাবে।

মৃগনয়নীও খুসী হয়। ঝুপ্ করে শুয়ে পড়ে। বলে,—আলোটা নিভিয়ে দাও।

বনবিহারী উঠতে উঠতে বলে,—বারে বা! আমায় ঘুম থেকে তুলে নিজে শুয়ে পড়ছ। আলোটা নিভিয়ে দেয় বনবিহারী।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। মনটা ওর চলে গেছে বাবার কাছে। বাবা নিশ্চয়ই জপে বসেছেন এখন। হৃদয়দার কাছ থেকে সবাই সব কথা নিশ্চয়ই শুনেছে। বাবা কিছু বলেন নি হয়তো। চুপ করে জপে মগ্ন হয়ে আছেন।

কর্ত্তাবাবু নিশ্চয়ই রেগে গেছেন। কর্ত্তামা হয়তো বলেছেন,—মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়েছি। মা হয়তো বলছে,—ভাবব মেয়েটা মরে গেছে। সবাই বলবে। ওটা হতভাগী! মৃগনয়নীর চোখ দুটো ভিজে ভিজে লাগে। চোয়াল দুটো আট হয়ে আসে। বনবিহারীর একটা হাত এসে পড়েছে ওর গায়ের ওপর। ভাল লাগে না। হাতটা সরিয়ে দেয়।

দিদি নিশ্চয়ই এর ভেতর দুতিনবার ঘুরে গেছে। মনে মনে হাসছে মৃগনয়নীর খবর শুনে। আর পুঁটি? আয়না মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে আছে সামনের প্রান্তরে। সামনে আমবাগান ছাড়িয়ে অনেক পরে সড়ক, তারপর সরু খালের ক্ষীণ স্রোত সাদা একটানা সুতোর মত তারপর ক্ষেত, ধূ ধূ ক্ষেত। অনেক অনেক দূরে বিন্দুর মত সীমানার বটগাছ। তারপর ছড়ান আকাশ। নীলে নীল। নিঃসীম।

মৃগনয়নী মগ্ন হয়ে আছে চোখ বুজে।

দু চার বার ঠেলে সাড়া না পেয়ে বনবিহারী ঘুমিয়ে পড়ে।

মেজদাকে অগত্যা বনবিহারিকে বলতেই হোল। টাকা মজুত আছে শুনে রাজী হোল মেজদাদা। পৌষ নয়। মাঘ মাসে ভাল দিন দেখে কলকাতায় যেতে কোন আপত্তি তার নেই। সেখানে যদি চাকরী মেলে, তবে ন'বৌমার টাকাটা ফেরত দিলেই চলবে। ধার হিসেবেই নেওয়া যাক এখন। তাইতো ধার ছাড়া আবার কি! বনবিহারী আরও খুসী। যাই বলুক না কেন সবাই। নবৌমা লক্ষী! তা নিজের ইয়ের কথা আর নিজে কি করে বলে বনবিহারী। ওর মায়ের কৃপা।

ওখানে গিয়ে প্রথম জ্যাঠতুতো ভাই যামিনীর ওখানেই ওঠা যাবে। যামিনীদা নিশ্চয়ই খুসী হবেন? খুসী না হলেও থাকতে হবে। দায়টা এখন ওদেরই। সব তাহলে ঠিকঠাক। পাকাপাকি কথা হয়ে যায়। কথাটা প্রমদাসুন্দরীর কানে যায়। প্রায় লাফাতে লাফাতে মৃগনয়নীর সামনে হাজির।

মৃগনয়নী রান্নাঘরের কাছে ছিল।

—বলি, হ্যাগা এতেতেও মন ভরল না, এখন ভাই দুটোকে সহরে তাড়িয়ে দিয়ে মারবার ফিকির!

চমকে ওঠে মৃগনয়নী। ঘরে বসে বনবিহারী আর ওর মেজদা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন-সঞ্চারিণী

আবীর ঘোষ

আলাপে সচেই যতি টেনে
অগত্যা—এখন আসি, নমস্কার—
বিদায় নেওয়ার সুরে বলা,
চোখ থেকে চোখ তুলে নিয়ে
অনিচ্ছায় বাড়ী মুখো চলা।

দিন যায়, মনের সংস্কার
প্রত্যাহাতে মহার্ঘ খানিক
সময়ের স্মৃতি-ছায়া আনমনে
মাথে আর নিরাকার
সুখ-স্বপ্নে জালায় মানিক।

কখনো কাঁপুনি দিয়ে শীতরাত
দীর্ঘ ঘুমে হ্রস্ব যতি টানে,
কুয়াশায় ঘেরা এক মহাদেশে
উড়ে বলে আলোর জোনাকী,—
আলেয়ার মায়ার প্রপাত।

মানে খুঁজে বেড়াই সেথাও।
রাত্রির হৃৎপিণ্ড নাচে দ্রুততাল
ছুঁতে পেয়ে মৌন জিজ্ঞাসার
এক বিবাগী আবেগ। অন্তরাল
লুপ্ত হয়ে জাগে সুপ্ত স্বপ্ন-মুখ

দ্বিগুণ সৌরভ ভরা। পূর্ণ-ছবি
সঞ্চারিণী সদ্য-ফোটা পদ্ম যেন।
কোমল আশ্লেষ দেয় অস্তিত্বের
হুবহু মুদ্রণে। সচেতন ক্ষণ
ব্যর্থ সাধে খোঁজে তারি জের।

আলো আলো

সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

মেঘের পাষাণ ভেঙ্গে আলোর অলকানন্দা এলো
শ্রান্তিহীন শ্রাবণের বিরহিয়া দিনরাত রাত
নিঃশব্দ পাখায় ভেসে দূরদেশে উড়ে চলে গেলো
রক্তে রক্তে মত্ত দোলা কী আনন্দে জাগালো প্রভাত !

যৌবনা নদীর গান কান পেতে মগ্ন হয়ে শোনে
শ্যামলে গৈরিক ঢাকা দুপারের যুগ্ম বনভূমি
স্তব্ধ হয়ে সূর্য শুধু চেউয়ে চেউয়ে আপনাকে গোণে
নদীর সরোদে সুর : তুমি-আমি তুমি !

কার্ণিশের সিঁড়ি বেয়ে রোদের সমুদ্রে দেহ ধুয়ে
বাসন্তী রঙের শাড়ী দোল্ খায় বাতাসে মাতাল
ও-বাড়ীর মেয়েরাও আকাশের মুখে পিঠ থুয়ে
চুলের অরণ্যে যেন পেতে চায় সূর্যের সকাল !

মেঘদূত শেষ হলো, আলো আলো কী বাউল হাওয়া !
কান্না মোছ, পান্না হোক অশ্রুমাখা যতো গান গাওয়া ॥

শিশুশিক্ষা সমস্যা

আমার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের শিক্ষা ব্যাপারে বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। এমন সমস্যায় হয়তো আমার পিতৃদেবও পড়িয়াছিলেন আমার শিক্ষার ব্যাপারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অনন্তোপায় হইয়া পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ঘানিতে আমায় জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘুরপাক খাইয়া একদিন থামিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রশংসা কুড়াইয়া আনিয়াছিল, এবং যথা সময়ে একটি চাকুরী সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলও বটে। কিন্তু শেখা হয় নাই কিছুই। স্বীকার করিতে লজ্জা নেই, চোখের ঠুলি খুলিয়া দেখিলাম 'পাদমেকম্' অগ্রসর হই নাই। দোষ কাহাকে দিব? এতোগুলি পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা স্বত্বেও এই যে "চক্ষুরুন্মীলনে" ত্রুটি, এর জন্য আমি বা আমার পিতৃদেব হয়তো কিয়দংশ দায়ী কিন্তু পর্যত প্রমাণ দায়িত্ব যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এ-বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সমস্যা বহুমুখী; কিন্তু উপস্থিত আমি পাঠ্যতালিকা ও ছাত্রের বোধক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতেছি।

বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল, হিন্দী—এই কয়টি বিষয়ভার লইয়া আমার পুত্র চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ আরম্ভ করিল। বাংলা, ইংরাজীর টেক্সট্ বুক, ব্যাকরণ, ওয়ার্কবুক ইত্যাদি আছে। সেগুলির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সাহিত্যপাঠের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উহার ব্যাকরণ পাঠ। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কখন? একটি আট নয় বৎসর বয়স্ক শিশুকে কর্তা, কর্ম, কারক বা বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দেওয়া কি সহজ কথা? শতকরা নিরানব্বইটি শিশু বাধ্য হইয়া বিষয়টি পাশ কাটাইয়া যায় অথবা মরিয়া হইয়া মুখস্থ করিয়া রাখে। অনেকে বলিবেন, কেন মহাশয়, আগেকারকালে ঐ বয়সের শিশু গুরুগৃহে বসিয়া বহু শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত, বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিত, প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিত। আপনার শিশু কেন পারিবেন না? কেন সে ব্যাকরণ বুঝিবে না?

মানিয়া লইলাম, সে-এক যুগ ছিল যখন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশু শ্লোক আওড়াইত, ভুল ধরিয়া গুরুজনের বিরাগভাজন হইতেও দ্বিধাবোধ করিত না এবং অভিশাপে অষ্ট-অঙ্গ-বক্র অবস্থায় অষ্টাবক্রমুনী নামে অমর হইত। কিন্তু হায়, সে যুগ কি আর ফিরিবে? এখন আমার আপনার শিশুরা জন্মগ্রহণই করিতেছে অষ্টাবক্ররূপে। অর্থাৎ তাহাদের সে মেধা বুদ্ধি নাই, দীপ্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই—কিছু নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেকালের সে গুরুগৃহ, সেই দুগ্ধব্রত কদলীর যুগ আর ফিরিয়া আসিবে না। অতএব এখনকার অবস্থানুযায়ী বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে হইবেই।

ধরুন, ইতিহাস ভূগোলের কথা। এই দুটি বিষয় খুব মনযোগ সহকারে আমার পুত্রকে পড়াইয়াছিলাম। পাঠ্য তালিকায় ছিল : প্রস্তর যুগের কথা, মাহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পার কথা, বৈদিক যুগ (সে-যুগে সমাজ ব্যবস্থা, নারীর স্থান), রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। বুদ্ধ, অশোক,

শক হুণ কিছুই বাদ ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীতে যাহা কিছু পাঠ্য ছিল সেগুলি সবই। তদুপরি আরও কিছু। গোটা হিন্দুযুগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি। আলেকজাণ্ডার, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, কনিষ্ক, অশোক, গুপ্ত সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধন (পাঠক আমায় ক্ষমা করিবেন, ইতিহাসের পুস্তক কাছে উপস্থিত না থাকায় উপরোক্ত তালিকাটি কালানুক্রমিকতার দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সম্ভব !) প্রভৃতি প্রত্যেকটির প্রশ্নোত্তর পৃথকভাবে লিখিয়া দিয়াছিলাম এবং আমার নিপীড়িত পুত্র বাধ্য হইয়া সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। ফলে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তাহার কষ্ট হয় নাই। এরপর একদিন কথায় কথায় পুত্র-আমার প্রশ্ন করিল : বাবা! বুদ্ধ বুঝি অনেকদিন আগে জন্মেছিলেন ? উত্তর দিলাম : হাঁ বাবা, খৃঃ পূর্ব ৫৬ সালে বোধহয়। তোমার ইতিহাসের বইটা খুলে একবার মিলিয়ে দেখে নাও। এই সূত্রে 'খৃষ্টপূর্ব' কথাটি আরও একবার বুঝাইবার দরকার হইল। আগের মতন এবারও সে খুব মন দিয়া শুনিল। তারপর প্রশ্ন করিল : আমার 'চুলদাড়ও' তখন বয়স কত ? (পাঠককে বলিয়া রাখি, আমার বাবার মাথায় এক সময় কাঁধ পর্যন্ত চুল ছিল বলিয়া আমার পুত্র তাঁহাকে 'চুলদাড়' বলিত) প্রশ্ন শুনিয়া আমি থ হইয়া গেলাম। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে, অর্থাৎ ছটি বৎসর ধরিয়া সে কেমন ইতিহাস শিখিল, আপনারাই বলুন। এখন পঞ্চম শ্রেণীতে সে বাবর হইতে আরম্ভ করিয়াছে শেষ করিবে বোধহয় আওরঙ্গজেবে। আশা করি ভালো নম্বরই পাইবে। কিন্তু ? সেই 'কিন্তু'ই থাকিয়া গেল না কি ?

ভূগোলেও সেই একই কথা। 'গ্রাম কাহাকে বলে' এই অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ইউনিয়ন বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, বাংলা দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলার বড় বড় নদী, শহর, শিল্পদ্রব্য সে মুখস্থ করিয়াছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে। এই বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে সে পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি; জলবায়ু, কৃষিদ্রব্য, অরণ্য সম্পদ, খনিজদ্রব্য, সেচব্যবস্থা সবই পাঠ করিবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাহার সন্দেহ ঘুচে নাই—কলকাতা বড় না বাংলাদেশ বড়। এখন আপনারাই বলুন, এই বয়সে এই সব ক্লাসে ইতিহাস ভূগোল পড়াইবার সার্থকতা কোথায় ? আমার পুত্রকে বোকা হাঁদা বলিয়া বিষয়টি উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ঘরে ঘরে অকারণে অবোধ শিশুরা পাঠ্যপুস্তকের নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, অমূল্য সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে বাধ্য হইতেছে। আর আমরা অসহায় অবস্থায় ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতেছি।

আমাদের মনে হয় দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের কেবলমাত্র সাহিত্য পড়ানো উচিত। তাহারা ঐ বয়স পর্য্যন্ত ভালো করিয়া বাংলা, ইংরাজী ও অঙ্ক শিখুক বাংলা পাঠ্যপুস্তকে গ্রাম জনপদের কথা থাকুক। ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকেও তাই। ছেলেরা ভালো করিয়া বানান, মানে ও রিডিং পড়িতে শিখুক। অনেক শব্দের সহিত পরিচয় ঘটিবে, সাহিত্যের পাঠ তাহাদের বোধোদয়ের সহায়ক হইবে; মাষ্টারমহাশয়দের ভাষায়, আগে তাহাদের 'কান' তৈয়ারী হোক, তারপর ব্যাকরণ। আগে তাহাদের বুদ্ধি পরিণত হউক, কাল ও স্থানের জ্ঞান স্বচ্ছ হউক—তাহার পর ইতিহাস ভূগোল পাঠ।

সরিৎশেখর মজুমদার

আত্মীয়তার বালাই

আত্মীয়তার সম্পর্ক অতি মধুর বলেই ধরে নেওয়া হয়। আত্মীয় বা বন্ধু এক কথায় আমরা যাদের স্বজন বলে মনে করি, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে একটা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আজ বাংলার সমাজে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে আত্মীয়তার এই প্রচলিত অর্থ বিলুপ্ত বললে অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশে আত্মীয়তা আজ আদায়ের উপায়মাত্র ;

ধরুন আমাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অলিখিত নিয়মে ধরে নেওয়া হবে যে এই ডাক্তারের অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য হ'ল যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে বিনাপারিশ্রমিকে তাদের সকলকে চিকিৎসা করা। একথা কারোর মনে ওঠে না যে যথার্থ আত্মীয়তার পরিচয় হল এই নবীন চিকিৎসককে প্রতিষ্ঠিত হ'তে সাহায্য করায়—তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থাৎ 'ফি' থেকে বঞ্চিত করলে যে তাকে সাহায্য করা হয় না এ'ত সাধারণ বুদ্ধির কথা, কিন্তু পরমাত্মীয়রা তা বোঝে কি ? না, আমাদের দেশে আত্মীয় ডাক্তারকে কি দিলে তাকে অনাত্মীয়জ্ঞান করা হয় !

উকিল হলেও একই ব্যাপার। তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা লেখকের। আপনি যদি কোন বই লিখে থাকেন তবে আপনার পবিত্র দায়িত্ব হ'ল দূর-নিকট সেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব আছেন খোঁজ করে তাদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের শ্রীহস্তে আপনার আত্মীয়তার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হ'বে। সেই বই পড়া হবে বলে যদি কল্পনা করে থাকেন তবে উচ্চাশার তারিফ করতে হয় (অবশ্য ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়) যদি কোন ফ্যাশনেবল্ ঘরের শো-কেসে (বইয়ের শেল্‌ফ্ বলব না) আপনার বই স্থানলাভ করে তে ভাগ্য ভাল ; কিন্তু সাধারণত অন্যান্য ছেঁড়া বা বাজে কাগজের সঙ্গে আপনার সাহিত্যপ্রচেষ্টাও যে সের-দরে বিক্রি হবে এটা ধরে নেওয়াই সমীচিন। যদি চিত্রশিল্পী হন তা কারোর বাড়ী গেলেই একটা ছবি এঁকে দেবার ফরমায়েস হবে ; হয়ত পরের দিন গিয়ে দেখবেন আপনার অনেক সময়-লাগান সেই ছবি উনান ধরান'র কাজে লেগেছে অথবা আরও আপত্তিকর কোনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দোকানী হ'লে কিছুটা সুবিধে এই যে মাগ্‌না জিনিষ দিতে হয় না, কিন্তু একদিক দিয়ে তা ও বুঝি ভাল। কারণ এক্ষেত্রে চলে ধার যা কোনদিন শোধ হবার নয়। যদি বা কোন সজ্জন ধার শোধ দেবার সদিচ্ছা করেন ত দেখা যাবে, ইতিমধ্যে ধারে ধারে জর্জ্জরিত হয়ে বেচারী দোকান গুটিয়ে ফেলেছে। কত আর উদাহরণ দেব।

তবে এই আদায়পর্ব একতরফা নয়। অপর তরফে ডাক্তার উকিল ইত্যাদিও কম যান না। আপনি হয়ত কোন সরকারী কর্ম্মচারী, আপনার ডাক্তার আত্মীয়টি তার আত্মীয়তার

সুবাদে কোন বিশেষ সুবিধা (যেমন কোন পারমিট) আপনার মারফৎ ঠিকই আদায় করে নেবেন। আপনি যদি স্কুলমাস্টার হন, আপনার উকিল বন্ধুটি আপনার মাধ্যমে তার ফেল করা পুত্রের প্রমোশনের ব্যবস্থা ঠিকই করে নেবেন। হয়ত বা আপনি অফিসার, লেখক বন্ধুটি তার শ্যালকের চাকরীর উমেদারীতে আপনাকে উত্যক্ত করে তুলবে! অন্য যা-ই হোন আপনার আটিই কুটুম্বটি হয়ত আপনার অন্দরমহলে অন্তরঙ্গতার ক্রমোন্নতিতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ফেলেছে যে কন্যাদায়ের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আরও গুরুতর) দুশ্চিন্তায় আপনার আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবার দাখিল।

তাই একালের আত্মীয়তার মধ্যে দেওয়া আর নেওয়া দুই-ই আছে, একথা খুবই সত্যি। কিন্তু কি তার চেহারা?

দেওয়া নেওয়ার আর এক দায় উপহার-রীতি। বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করেন এমন লোকের সংখ্যা বিরল নয় কি? অন্তত মধ্যবিত্তদের মধ্যে এধরণের লোক প্রায় নেই বল্লেই চলে, দরিদ্রের কথা না হয় ছেড়েই ছিলাম। কারণ সকলেই জানেন। শুধু বিয়ে নয়, বাচ্চার অন্নপ্রাশন, খোকা খুকুর জন্মদিন (খুকুদের জন্মদিন বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত চলে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপহারের ঠেলাও বাড়ে) ত আছেই তার উপর আজকাল খুকুদের মায়েদেরও জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকী, বুড়ো বুড়ীর বিবাহের রজতজয়ন্তী—দিনকে দিন যে হারে উপহারের উপদ্রব বেড়ে চলেছে তাতে এক একবার কি মনে হয়না যে এই আত্মীয় সংকুল সংসার ছেড়ে নির্জন বনে গিয়ে বসবাস করি?

উপহার যারা দেন শুধু কি তাদেরই ভাবনা? যারা আয়োজন করেন তাঁদের অবস্থাও কোন অংশে শ্রেয় নয়। নিমন্ত্রণকারীরা কেউই সম্ভবত উপহারের কথা মনে রেখে নিমন্ত্রণ করেন না। (উপহারও ত জানা, বিয়ের বেলা অসংখ্য অকেজো সিঁদুরের কৌটো, খোকার জন্মদিনে একই ধরনের খেলনা-তা ছাড়া কার কাছ থেকে কী উপহার পাওয়া যাবে তার স্থিরতা কি আর সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের ভাববার অবসর থাকে কমই)। নিমন্ত্রণের সবচেয়ে বড় ভাবনা, কেউ যেন বাদ না পড়ে, তবেই সর্বনাশ! সারাবছর মুখদেখা নেই হয়ত, তাতে কি? ক্রিয়াকর্মে বাদ দিন, অনাত্মীয় জ্ঞান করা হবে! নিমন্ত্রণ পেলেও অশান্তি, না পেলেও অশান্তি।

আত্মীয়তার এই দায় বাংলার সমাজকে যে অক্টোপাসের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে তার বজ্র আটুনি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কে না ব্যাকুল? অথচ মজা এই যে, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা যতই বাড়ছে পাকে চক্রে সেই অক্টোপাসকেই আমরা আকড়ে ধরছি। কে জানে এই পরিস্থিতির শেষ কোথায়?

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীর বিজয় অভিযানের যে কী মস্ত ইতিহাস আছে তা পাঠক জানেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" যখন সর্বপ্রথম পড়ি তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি পেয়েছিলুম। অনুভূতি কেন; রোমাঞ্চানুভূতি বলা যেতে পারে। মনে হয়েছিল বাঙালী বলতে শুধু "অর্দ্ধশিক্ষিত কেরাণী ও অশিক্ষিত বেণিয়ান" বোঝায় না। অন্তত ইতিহাসের সত্য নয়, সুতরাং 'বোতাম আটা জামার নিচে' শান্তিপ্রিয় বুকটাকে চিতিয়ে বলতে সাধ হয়েছিল যুদ্ধং দেহি। কিন্তু রণক্ষেত্র কোথায়! উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, বিহার না বাঙলা!

শুধু ইংরেজ অভ্যুদয়ের যুগ কেন, কখনও বাঙালীর অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস ছিল না, যেমন আজ আছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বেলাতেই হোক আর বাঙালী বণিকের শিল্পজাত দ্রব্যের বেচাকেনা ব্যাপারেই হোক, একটা নিভিক এ্যাডভেঞ্চারের নেশাই যেন গৌড়ের ঐশ্বর্য ও তার শক্তিবৃদ্ধির প্রধান সহায় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দেখি সেই অপূর্ব যুগটাই বাঙালীর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের বিশাল স্বাক্ষর বুকে ধরে রেখেছে। এরপর ইংরেজ যুগ; এবং সৌভাগ্যক্রমে সে যুগেও এই এ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছোট ছোট কত যে উপনিবেশ গড়ল তার ইয়ত্তা নেই। তার মৌলিক চিন্তাধারা, তার সংস্কৃতি, যুগোপযোগী নব্য ভাবনা সমগ্র ভারতে যেন বাঙালীর পৌরুষ পতাকা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত করে এল। ঘরে ঘরে গৌড়জনের প্রশংসা, আর সাগরে সাগরে বাণিজ্যের বিস্তার।

সে বাণিজ্য স্বতন্ত্র সংস্কৃতির এবং নিভিক সচেতন আত্মঘোষণার। কিন্তু সে যুগ চলে গেছে, এবং এই উৎসাহ, এ্যাডভেঞ্চারের নেশার পরেও যেন চরম বিস্মৃতির পূর্বচ্ছেদ পড়েছে। আজ বাঙালী নিজভূমে পরবাসী।

অনেকের মতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এই অবক্ষয়ের কারণ স্বাধীনোত্তর যুগের অন্যতম রাষ্ট্রনীতির হট্টগোল। আবার অনেক ফোঁগ্রালিষ্ট মনে করেন এই সমাজবাদের যুগে মহাজাতি চিন্তার ক্ষেত্রে এমন খণ্ড খণ্ড উপনিবেশ সৃষ্টির নেশা নিরুষ্ট সংস্কৃতি। এদের দুদলের আপোস মীমাংসার দায়িত্ব লেখকেরও নয়—পাঠকেরও নয়। হয়ত এদেরও নয়। রাষ্ট্রিক আর সাংস্কৃতিক হাটের এ গোলযোগ চিরকালের; কারণ এতে কোন তরফের লাভ লোকসানের বালাই নেই। শুধু যথার্থ হল এমন দেউলিয়ার হাটে আরও আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে যদি এই ধারার পরিক্রমণ চলে তবে এককালের বাঙালীর বল, বুদ্ধি সাহসের সবত্র ইতিহাসটি অনেকের কাছেই আষাঢ়ে গল্পের অবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে মাত্র।

অবশ্য প্রসঙ্গত দুটি যুক্তিরই অকাট্যতা অনেকে স্বীকার করবেন। বাঙালীমনে যে এ্যাডভেঞ্চারের নেশা ইংরেজ আমলের অভ্যুদয়ের অনেক অনেক আগে থেকে ইংরেজ শাসনের শেষ

অধ্যায় অব্দি প্রবহমান ছিল অকস্মাৎ তা থেমে গেল কেন। কারণ একটা আছে বৈকি! অবক্ষয় এসেছে আমরা তা অনুমান করি। কারণ তা যুগোপযোগী। আর এ কথাও সত্যি ঔপনিবেশিক চিন্তাধারাও ঠিক এ যুগীয় নয়। বিবর্তনবাদের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত জরুরী অধ্যায় হল মানুষ জাতির অসমান উন্নতি। পৃথিবীতে সব জাতিই অন্তত চিন্তার সাম্রাজ্যে সমান উন্নত নয়। কিন্তু সেইহেতু একটা জাতির ওপর আর এক জাতির প্রভুত্ব তা সে সাংস্কৃতিক হক আর রাষ্ট্রীকই হক এক রকমের স্বার্থপরতা। তাছাড়া সাংস্কৃতিক আত্মকেন্দ্রিকতার কথাও ভাবা দরকার যে কারণে আজ এই অবক্ষয় একটা ভয়াবহ উন্নাসিক গতিবদ্ধতা যেন বাঙালীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা ভুললে চলবেনা, এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবধারা যার অপর নাম সাংস্কৃতিক প্রাদেশিকতা থেকেই রাজনীতিক প্রাদেশিকতার জন্ম হয়েছে; এবং ১৯৪৭ সালের পর সে প্রাদেশিকতার রূপ এত উগ্র যে পরভূমে ও নিজভূমে বঙ্গসংস্কৃতি বিপন্ন।

সুতরাং আজকের দিনে যা সত্য তা আত্মরক্ষা। মানুষের একটা অতি আদিম বিশ্বাস হল মৃত্যুর জীবনের আশ্বাস। সেই পুরোনো পাথরের যুগের অধ্যায় থেকে বর্ত্তমান এ্যাটম যুগ অব্দি চিন্তাভাবনার প্রশ্রয় দেখতে পাই। অতএব আত্মরক্ষার আড়ালে নতুন করে জীবনস্বপ্নবিলাস মোটেই অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা হবে না। আসল কথা হল কোনরকমে সমাধিরচনার কালটা কিছু পিছিয়ে দেওয়া—সাময়িক ভাবে কিংবদন্তীর আশ্রয়ে থাকলেও ইতিহাস রচনার উপাদান গড়ে নেওয়া।

রবীন্দ্র সেনগুপ্ত